দলিলসহ

নামাযের মাসায়েল



মাওলানা আব্দুল মতিন

Dolilsoho Namazer Masayel

Reference Book of Salah for Hanafi Majhab,
Created for reference use only, not recommended.
USE OF THIS BOOK IS AT YOUR OWN RISK

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার
১২৮, আদর্শ নগর, মসজিদুল ইকরাম সংলগ্ন, মধ্যবাড্ডা,ঢাকা -১২১২
ফোন: ৯৮৮১৫৩২, মোবা: ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

সূচীপত্র

^ List

ইকামতের বাক্য গুলো দু'বার করে বলা সুন্নত

১. হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আবী লায়লা র. বলেন–

حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْد الأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَان أَخْضَرَان عَلَى جذْمَة حَائط ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلاَلٌ ، فقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف(٢١٣١)

واخرجه الطحاوى ١/١٠٠-١٠٢ و ابن خزيمة فى صحيحه ٣٨٠ والبيهقى ١/٤٢٠ من طريق ابن ابى شيبة. قال ابن حزم الظاهرى : هذا اسناد فى غاية الصحة. وقال الماردينى فى الجوهر النقى : رجاله على شرط الصحيح.

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাধিক সাহাবী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারী রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি যার পরনে ছিল সবুজ রং এর একজোড়া কাপড়- যেন দেয়ালের একাংশে দাঁড়িয়ে জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন এবং ইকামাতও দিলেন জোড়া জোড়া শব্দে। আর কিছুক্ষণ (মাঝখানে) বসে রইলেন, তিনি বলেন, পরে বিলাল রা. তা শুনলেন এবং তিনিও জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন, জোড়া জোড়া শব্দে ইকামাত দিলেন। আর (আযান ও ইকামাতের মাঝখানে) একটু বসলেন। ইবনে আবী শায়বা রা. আল মুসান্নাফ, হাদীস নং (২১৩১) তাহাবী. ১ম খ: ৪২০ পৃ. সহীহ ইবনে খুযাইমা হাদীস নং ৩৮০ সুনানে কুবরা, বাইহাকী ১/৪২০

ইবনে হায্ম বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত সহীহ। আলাউদ্দীন মারদীনী র. বলেছেন–এটি সহীহ হাদীসের মানোত্তীর্ণ।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. থেকে বর্ণিত–

^ List

قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه و سلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة.

رواه الترمذى-١٩٤.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযান ও ইকামাত ছিল জোড়া জোড়া শব্দে। তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৪

৩. আব্দুর রাহমান ইবনে আবী লায়লা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْفَعُ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف رقم ٢١٥١

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুয়াযি্যন আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারী রা. আযান ও ইকামাত জোড়া জোড়া শব্দে দিতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা, হাদীস নং ২১৫১।

৪. ইবনে আবী লায়লা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً قَائِمًا عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، رواه ابن ابى شيبة فى المصنف رقم-٢١٣٧ وابو داود رقم ٥٠٦ كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به.

অর্থ: সাহাবীগণ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আনসার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতকাল যখন আমি ফিরে গেলাম এবং আপনার পেরেশানী দেখলাম, তখন আমি দেখলাম একটি লোক যেন মসজিদে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরিধানে ছিল সবুজ রং এর দুটি কাপড়। তিনি আযান দিলেন। পরে একটু বসলেন। অতঃপর আবার দাঁড়ালেন এবং আগের মতোই বললেন। শুধু এবার قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، বাড়িয়ে বললেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৩৭; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫০৬।

৫.হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন–

قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَالَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ « حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ». قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَقِّنْهَا بِلاَلاً ». فَأَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ.اخرجه ابوداود رقم-٥٠٧

অর্থ: আনসার গোত্রের লোক আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. আসলেন। তিনি এও **বললেন,** (ঐ ব্যক্তি যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন) কিবলামূখী হলেন, এবং **বললেন,** আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, **আশহাদু** আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু **আন্না** মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হায়্যা আলাস সালাহ, দু'বার, হায়্যা আলাল **ফালাহ,** দু'বার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,। তবে '**হায়্যা** আলাল ফালাহ' বলার পর 'কাদ্ কামাতিস্ সালাহ, কাদ্ কামাতিস্ **সালাহ'** বৃদ্ধি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, **বিলালকে** এগুলি শিখিয়ে দাও। এর পর থেকে বিলাল রা. এগুলি দিয়েই আযান **ইকামাত** দিতেন। আবু দাউদ,হাদীস নং ৫০৭।

৬. **আবু** মাহযূরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اخرجه الترمذى رقم- ١٩٢ والطيالسى رقم ١٣٥٤ والدارمى ١١٩٦، ١١٩٧ والنسائى ٦٣٠ وقال الترمذى حسن صحيح.

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের কালিমা ১৯ টি ও **ইকামাতের** কালিমা ১৭ টি শিখিয়েছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২; আবূ দাউদ **তায়ালিসী,** হাদীস নং ১৩৫৪; দারিমী, হাদীস নং ১১৯৬, ১৯৯৭; নাসাঈ, **হাদীস** নং ৬৩০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৭. আবূ মাহযূরা রা. বর্ণনা বলেন–

عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الأَذَانُ : . . . . وَالإِقَامَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.اخرجه ابن ابى شيبة رقم– ٢١٣٢ وابو داود رقم ٥٠٢ كلاهما من طريق همام عن عامر الاحول. وفى طريق لابى داود وعلمنى الاقامة مرتين.رقم٥٠١

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের কালিমা শিখিয়েছেন ১৯ টি, আর ইকামাতের কালিমা শিখিয়েছেন ১৭ টি। আযানের কালিমাগুলি বলার পর তিনি বলেন, আর ইকামাতের কালিমাগুলি হলো– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হায়্যা আলাস্ সালাহ, হায়্যা আলাস্ সালাহ, হায়্যা আলাল্ ফালাহ, হয়্যা আলাল্ ফালাহ, কাদ্ কামাতিস্ সালাহ, কাদ্ কামাতিস্ সালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ। মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা, হাদীস নং ২১৩২; আবূদাউদ, হাদীস নং ৫০২। আবূ দাউদ শরীফের আরেকটি বর্ণনায় আছে- আমাকে ইকামাতের কালিমা দু'বার করে বলা শিখিয়েছেন। (হাদীস নং ৫০১)

৮. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة.اخرجه عبد الرزاق ٤٦٢/١ والطحاوى ١٠٢/١ والدارقطنى ٢٤٢/١ كلهم عن معمر عن حماد عن إبراهيم عنه.واخرجه عبد الرزاق ايضارقم– ١٧٩١أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن

أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال كان أذانه وإقامته مرتين مرتين.

قال الماردينى فى الجوهر النقى:هذا سند جيد.

অর্থ: বিলাল রা. আযান (এর কালিমাগুলি) দু'বার করে বলতেন, ইকামাতও দু'বার করে বলতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ১ খৃ, ৪৬২পৃ; তাহাবী, ১ খৃ, ১০২ পৃ;। অন্য একটি সনদে আব্দুর রায্যাক রা. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিলাল রা. আযান ও ইকামাত দুবার দুবার করে বলতেন।(দ্র. ১/৪৬৩) আল্লামা মারদীনী র. বলেছেন–এর সনদ উত্তম।

৯. সুওয়ায়দ ইবনে গাফালা রা. থেকে বর্ণিত–

سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى اخرجه الطحاوى ١٠١/١

অর্থঃ তিনি বলেছেন, আমি বিলাল রা. কে আযান ও ইকামাত দুবার দুবার করে বলতে শুনেছি। তাহাবী, ১/১০১

১০. **হযরত** আবূ জুহায়ফা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

ان بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى.

اخرجه الطبرانى فى الكبير ١٩٢/٩ والدارقطنى ٢٤٢/١ وفى اسناده زياد

بن عبد الله البكائى مختلف فيه واحتج به مسلم.

অর্থ: বিলাল রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আযানও দিতেন জোড় শব্দে, ইকামাতও দিতেন জোড় শব্দে। তাবারানী, ৯/১৯২ দারাকুতনী, ১/২৪২

১১. হাজান্না ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ ، وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ : أَلاَ جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لاَ أُمَّ لِلآخَرِ. اخرجه ابن ابى شيبة رقم–٢١٤٩

অর্থ: আলী রা. বলতেন, আযান ও ইকামাতের বাক্যগুলো দুবার করে বলতে হবে। তিনি একজন মুয়াযি্যনকে একবার একবার করে ইকামাত বলতে শুনলেন। তাকে তিনি বললেন, দুবার করে বললেনা কেন? হতভাগ্যের মা না থাক। মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা, হাদীস নং ২১৪৯।

১২. উবায়দ রা. থেকে বর্ণিত,

قال ان سلمة كان يثنى الاقامة . اخرجه الطحاوى ١٠٢/١

অর্থ: সালামা ইবনুল আক্ওয়া রা. ইকামাতের শব্দগুলো দুবার করে বলতেন। তাহাবী, ১/১০২

১৩. আবূ ইসহাক রা. থেকে বর্ণিত,

قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ. اخرجه ابن ابى شيبة رقم-٢١٥٤

অর্থ: তিনি বলেন–হযরত আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্উদ রা. এর শিষ্যগণ আযান ও ইকামাতের বাক্যগুলি দুবার দুবার করে বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৫৪।

১৪. মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত,

قال ذكر له الإقامة مرة مرة فقال هذا شيء قد استخفته الأمراء الإقامة مرتين مرتين.رواه عبد الرزاق فى المصنف رقم-١٧٩٣

অর্থ: তিনি বলেন– তার নিকট ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলে তিনি বললেন, শাসকরা (বনী উমায়্যার) এটা হাল্কা করেছে। ইকামাতের শব্দগুলো হবে দুবার করে। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ১/৪৬৩; তাহাবী, ১/১০১

১৫. ইবরাহীম নাখায়ী রা. বলেন,

لاَ تَدَعْ أَنْ تُثَنِّيَ الإِقَامَةَ. اخرجه ابن ابى شيبة رقم- ٢١٥٣ ومحمد فى كتاب الحجة على اهل المدينة ص.٢٢

অর্থ: আযান ও ইকামাতের শব্দগুলো দুবার দুবার বলতে ছাড়বে না। মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা, হাদীস নং ২১৫৩; ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুলহুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা, পৃ. ২২।

^ List

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে পড়ার ব্যাপারে একটি মাত্র সহীহ হাদীস আছে বুখারী, মুসলিম সহ অনেক হাদীসের কিতাবে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস রা.। তিনি বলেছেন:

امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

অর্থাৎ বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আযানের বাক্যগুলো জোড় পড়তে, আর ইকামাতের বাক্যগুলো বেজোড় পড়তে। হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়– ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে পড়তে হবে।

আলিমগণ পূর্বের হাদীসগুলির কারণে এ হাদীসটির দুটি ব্যাখ্যা করেছেন:

এক. যারা এ হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ অনুসারে আমল করেন তারা সকলে শুরু ও শেষে আল্লাহু আকবার দুবার করেই বলেন। অথচ এতে জোড় সংখ্যা হয়ে যায়। ইমাম নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই সমস্যার সমাধানে বলেছেন, যেহেতু আল্লাহু আকবার দুবার বললেও এক নিঃশ্বাসে বলা হয় তাই এটাকে একবারের অর্থেই ধরা হবে। জোড় ধরা হবে না। হানাফী আলিমগন বলেন, বুঝা গেল অন্যান্য বাক্যগুলোও যদি এক নিঃশ্বাসে পড়া হয় তবে দুবার করে পড়লেও একবারই ধরা হবে, জোড় ধরা হবে না। তাই তাঁরা বলেছেন, সুন্নাত হলো প্রথম চার বার আল্লাহু আকবার এক নিঃশ্বাসে পড়বে। যাতে বিলাল রা. এর এ হাদীস অনুসারেও আমল হয়ে যায়।

দুই. এ হাদীসে যে একবার করে বলতে বলা হয়েছে, এটি পূর্বে ছিল। পরবর্তীকালে এ আদেশটি রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ পূর্ববর্তী হাদীসগুলো। ইমাম তাহাবী র. বলেছেন:

ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعلم أنَّ ذلك هو ما أمر به.

অর্থাৎ পরবর্তীতে বিলাল রা. ইকামাতের বাক্যগুলো দুবার করেই বলতেন; যা বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বুঝা গেল তিনি এই নিয়ম অনুসরণেও আদিষ্ট হয়েছিলেন।

খোদ আল্লামা শাওকানী র. –যিনি নিজেও লা-মাযহাবী ছিলেন– আবূ মাহযূরা রা. এর হাদীসের ভিত্তিতে বিলাল রা. এর একবার বলার আমলকে মানসূখ বা

রহিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নায়লুল আওতারে তিনি লিখেছেন-

وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح وبلال أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخا . وقد روى أبو الشيخ (أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مرتين مرتين وأقام مثل ذلك) إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفناه وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك .

অর্থাৎ একবার বলার আদেশ সম্বলিত বিলাল রা. এর হাদীসটির পরে হলো আবূ মাহযূরা রা. এর এ হাদীস। কারণ এটি মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। আবূ মাহযূরা রা. তো মক্কা বিজয় কালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবুশ্ শায়খ র. বর্ণনা করেছন যে, বিলাল রা. মিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে আযান ও ইকামাতের বাক্যগুলো দুবার করে বলেছেন।

এ আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইকামাতের বাক্যগুলো দুবার করে বলার হাদীসগুলো প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার উপযুক্ত। আর একবার করে বলা হাদীসগুলো যদিও অধিক সনদে ও বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার কারণে অধিক সহীহ, কিন্তু দুবার বলার হাদীসগুলোতে বাড়তি বিষয় রয়েছে, আর এগুলো পরবর্তী কালের বিধান সম্বলিত।এসব কারণে এগুলি অনুসারে আমল করাই বাঞ্ছনীয়। নাইলুল আউতার ২/২২

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই। ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হবে না দুবার করে, এ নিয়ে ফকীহ ইমামগণের মধ্যেও দ্বিমত ছিল। কিন্তু ঝগড়া ছিল না। বরং ইমাম ইবনু আব্দিল বার র. উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, দাউদ যাহেরী ও ইবনে জারীর তাবারী র. প্রমুখ এ দ্বিমতকে বৈধ মতানৈক্য আখ্যা দিয়েছেন, এবং বলেছেন যেভাবেই করুক জায়েয হবে। এমনকি লা-মাযহাবী আলেম তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার মুবারকপুরী সাহেবও লিখেছেন, একবার করে বলা বা দুবার করে বলা উভয়টাই আমার দৃষ্টিতে বৈধ।

তাহলে এতে ঝগড়ার কি আছে। কেন বলা হচ্ছে দুবার করে বলার কথা কোন হাদীসে নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন।

^ List

নামাযে কব্জির উপর হাত বেঁধে নাভির নীচে রাখা সুন্নত

নামাযে বাম কব্জির উপর ডান হাত রেখে দু'আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরা সুন্নত। একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা এ আমল প্রমাণিত । চার মাযহাবের সকল ইমাম ও আলিম এটাকেই সুন্নত পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কনুই পর্যন্ত হাত রাখার পক্ষে কোন হদীস নেই। বুখারী শরীফের যে হাদীসকে এর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয় সেটির সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা একটু পরে উল্লেখ করছি। এমনিভাবে নাভির নীচে হাত রাখা সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. দুজনেই এটাকে সুন্নত বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী র. এর ভক্ত ছাত্র। ইমাম শাফেয়ী বুকের নীচে হাত বাঁধাকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ সেই মতকে পরিহার করে নাভির নীচে হাত বাঁধাকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি কি হাদীস ছাড়া এটা করেছেন ? তিনি তো হাদীসের হাফেজ ছিলেন।

যাহোক, বুকের উপর হাত বাঁধাকে চার ইমামের কেউই সুন্নত বলেননি। এসম্পর্কে যে হাদীসটি পেশ করা হয় সেটিও সহীহ নয়। এখানে প্রথমত হাত বাঁধার পদ্ধতি সম্পর্কিত সহীহ হাদীসগুলো পেশ করবো। পরে নাভির নীচে রাখা সম্পর্কে সহীহ হাদীসসমূহ উল্লেখ করবো।

হাত বাঁধার নিয়ম সম্পর্কিত হাদীস

১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.صحيح البخاري (٧٤٠)

অর্থ : মানুষকে এই আদেশ দেওয়া হতো যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৪০।

২. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ يُصَلِّى فنظرت إليه فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى

كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ. أخرجه أبو داود (٧٢٧-٧٢٦) والنسائي (٨٨٩) واللفظ له وأحمد ٣١٨/٤ وابن خزيمة (٤٨٠) بإسناد صحيح. وفي رواية لأبي داود: ثم أخذ شماله بيمينه.

অর্থ: আমি (মনে মনে) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তা আমি লক্ষ্য করবো। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত কান বরাবর তুললেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন।

আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭২৬,৭২৭; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ৮৮৯; মুসনাদে আহমদ ৪খ, ৩১৮পৃ; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৪৮০।

আবূ দাউদ শরীফের আরেক বর্ণনায় আছে,

ثم أخذ شماله بيمينه

অর্থাৎ অতঃপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। এ হাদীসটি সহীহ। ইবনে খুযায়মা র. উক্ত হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন,

باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى

অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠ কব্জি ও বাহুর উপর রাখবে।

وعند الدارمي ٢٨٣/١ بإسناد صحيح في حديث وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَرِيباً مِنَ الرُّصْغِ .

অর্থাৎ দারিমী র. এর এক বর্ণনায় সহীহ সনদে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত বাম হাতের কব্জির কাছে রাখতে দেখেছি। সুনানে দারিমী, ১খ, ২৮৩পৃ।

৩. হযরত হুলব আততাঈ রা. বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. أخرجه الترمذي (٢٥٢) وابن ماجه (٨٠٩) وابن أبي شيبة (٣٩٥٥) والدارقطني ٢٨٥/١

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরতেন। তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৫২;

^ List

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে, ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরার বিবরণ দিতে গিয়ে ইয়াহইয়া র. ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখেছেন।

৪. হযরত শাদ্দাদ ইবনে শুরাহবীল রা. বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يده اليمنى على يده اليسرى قابضا عليها يعني في الصلاة . رواه البزار والطبراني .ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٢٥ وقال: وفيه عباس بن يونس ولم أجد من ذكره ،

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দন্ডায়মান দেখলাম। তার ডান হাতটি বাম হাতের উপর, তিনি সেটাকে চেপে ধরে আছেন। বাযযার ও তাবারানী এটি উদ্ধৃত করেছেন। (দ্র, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২খ, ২২৫ পৃ)

৫. হযরত জারীর আদ্দাব্বী বলেন,

كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه .أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٦١) موصولا والبخاري قبل حديث رقم ١١٩٨ تعليقا. كتاب العمل في الصلاة ، باب إستعانة اليد في الصلاة الخ

অর্থ: হযরত আলী রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখতেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬১; বুখারী শরীফ, ১১৯৮নং হাদীসের এর পূর্বে। এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

এসব হাদীসের কোন কোনটি থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন। আর কোন কোনটি থেকে বুঝা যায়, তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরতেন। বাম হাতের কোন জায়গা চেপে ধরতেন? অধিকাংশ হাদীসই প্রমাণ করে, বাম হাতের কব্জি চেপে ধরতেন।

এসব হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চার মাযহাবের আলিমগন সেই পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন যেভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আমল করে থাকেন।

হালবী র. মুনয়াতুল মুসল্লী এর ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

السنة أن يجمع بين الوضع والقبض جمعا بين ما ورد في الأحاديث المذكورة إذ في بعضها ذكر الأخذ وفي بعضها ذكر وضع اليد وفي البعض وضع اليد على الذراع فكيفية الجمع أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى ويحلق الإبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع وأنه أخذ شماله بيمينه اهـ

অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনকল্পে সুন্নত হলো হাত রাখা ও বাঁধা দুটির উপরই একসঙ্গে আমল করা। কারণ কিছু হাদীসে চেপে ধরার কথা এসেছে। কিছু হাদীসে হাতকে হাতের উপর রাখার কথা এসেছে। আর কিছু হাদীসে বাহুর উপর হাত রাখার কথা এসেছে । এগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি হলো, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা কব্জি চেপে ধরবে, আর বাকি তিন আঙ্গুল বাহুর উপর বিছিয়ে দিবে। তাহলে হাতের উপর হাত রাখা, বাহুর উপর হাত রাখা এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরা, সবগুলোই হাসিল হবে।

লক্ষ্য করুন, হানাফী আলিমগন কিভাবে হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে সবগুলো অনুসারে আমল করতে বলেছেন? একেই বলে হাদীসের অনুসরণ! এঁরাই প্রকৃত আহলে হাদীস। যারা একটি হাদীস নিয়ে অন্যগুলো উপেক্ষা করে তারা আহলে হাদীস হতে পারেনা।

ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ মত হলো ফরজ নামাযে হাত বাঁধবেনা, ছেড়ে রাখবে। সুন্নত ও নফল নামাযে হাত বাঁধবে। হাত বাঁধলে কিভাবে বাঁধবে? আল্লামা উব্বী মালেকী র. মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

واختار شيوخنا أن يقبض بكف اليمنى على رسغ اليسرى واختار بعضهم مع ذلك أن تكون السبابة والوسطى ممتدين على الذراع اهـ ٢٧٨/٢

অর্থাৎ আমাদের শায়েখগন বলেছেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। কেউ কেউ একথাও যোগ করেছেন, শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি যেন বাহুর উপর থাকে। (২খ, ২৭৮পৃ)

শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে ইমাম নববী র. তার 'আররাওজাহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

^ List

السنة وضع اليمنى على اليسرى فيقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها ٣٣٩/١

অর্থাৎ সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর এভাবে রাখবে যে, ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার হাড়, কব্জির কিছু অংশ এবং বাহু চেপে ধরবে। (২খ, ৩৩৯পৃ)

হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইবনে মানসূর আল হাম্বালী র. আররাওযুল মুরবি' গ্রন্থে লিখেছেন,

ثم يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته اهـ ١٦٥/١ وكذا في الإنصاف للمرداوي ٤٥/٢ والفروع لابن مفلح ٣٦١/١

অর্থাৎ অতঃপর বাম হাতের কব্জি ডান হাত দ্বারা চেপে ধরবে। এবং নাভির নীচে রাখবে। (১খ, ১৬৫পৃ); মারদাবী র. আল ইনসাফ গ্রন্থে (২/৪৫) ও ইবনে মুফলিহ র. আল ফুরু' গ্রন্থে (১/৩৬১) একই কথা বলেছেন।

লক্ষ্য করুন, পৃথিবীর অধিকাংশ আলিম-ওলামার মত কি, আর লা-মাযহাবী ভাইয়েরা কি করেন?

যে হাদীসটির কারণে তারা বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ডান হাত বিস্তার করে দেন সেটি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে ১নং দলিলে সেটি আমরা উল্লেখ করেছি। ঐ হাদীসটি সম্পর্কে বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন,

أبهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وصححه ابن خزيمة وغيره وسيأتي أثر علي رض نحوه في أواخر الصلاة. ٢٧٥/٢

অর্থাৎ বাহুর কোন জায়গায় রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট। আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত ওয়াইল রা. এর হাদীসে বলা হয়েছে: অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন। ইবনে খুযায়মা র. প্রমুখ এটিকে সহীহ বলেছেন। সালাত অধ্যায়ের শেষ দিকে হযরত আলী রা. এর অনুরূপ আছার (হাদীস) এর উল্লেখ আসছে। (২খ, ২৭৫ পৃ)

আল্লামা শাওকানীও (যিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেননা) নায়লুল আওতার গ্রন্থে বলেছেন,

قوله (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا .وقال تحت الحديث الذي قبله: والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبراني : (وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ) ١٨٧/٢

অর্থাৎ হাদীস শরীফে যে বলা হয়েছে " বাম বাহুর উপরে" বাহুর কোন জায়গায় তা এখানে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। আহমদ ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত পূর্বের হাদীসটিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আহমদ ও আবূ দাউদ বর্ণিত পূর্বের হাদীসটি আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী বলেছেন, এর মর্ম হলো তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখেছেন। তাবারানী র. এর বর্ণনায় এসেছে: তিনি নামাযে তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর কব্জির কাছে রেখেছেন। (২খ. ১৮৭ পৃ)

এসব থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হাদীসটির ভুল অর্থ বুঝে কনুই পর্যন্ত হাত বিস্তার করে থাকেন।

নাভির নীচে হাত রাখা

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه وإسناده صحيح. قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار : هذا سند جيد وقال الشيخ أبو الطيب السندي في شرحه على الترمذي : هذا حديث قوي من حيث السند وقال الشيخ عابد السندي في طوالع الأنوار: رجاله كلهم ثقات أثبات اهـــ

^ List

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে দেখেছি। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৫৯। এর সনদ সহীহ।

হাফেজ কাসিম ইবনে কুতলূবুগা র., তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার আবুত্ তায়্যিব সিন্ধী র. ও আল্লামা আবেদ সিন্ধী র. প্রমুখ হাদীসটিকে মজবুত ও শক্তিশালী বলেছেন। এর সনদ এরূপ: ইবনে আবী শায়বা র. ওয়াকী' থেকে, তিনি মূসা ইবনে উমায়ের থেকে, তিনি আলকামার সূত্রে হযরত ওয়াইল রা. থেকে। এই সনদে কোন দুর্বল রাবী নেই।

২.হযরত আলী রা. বলেন,

السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. أخرجه أبو داود (في رواية ابن الأعرابي وابن داسة) ٧٥٦ وأحمد ١/١١٠ (٨٧٥) وابن أبي شيبة (٣٩٦٦) والدارقطني ١/٢٨٦ والضياء في المختارة ٢/٧٧٢ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. ولكن يشهد له الحديث السابق.

অর্থ: সুন্নত হলো তালু তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা । আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫৬; মুসনাদে আহমদ ১খ, ১১০ পৃ, হাদীস নং ৮৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬৬; দারাকুতনী, ১খ, ২৮৬পৃ; যিয়া ফিল মুখতারা, ২খ, ৭৭২পৃ। এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক রয়েছেন। তিনি দুর্বল। তবে প্রথম হাদীসটি এর সমর্থন করছে।

৩.হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. أخرجه أبو داود (٧٥٨) وفيه عبد الرحمن المذكور.

অর্থ: হাতের তালু অপর তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে হবে। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫৮। এতেও পূর্বোক্ত আব্দুর রহমান রয়েছেন।

৪.হযরত আনাস রা. বলেছেন,

ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة. أخرجه ابن حزم في المحلى تعليقا ٣/٣٠

অর্থ: তিনটি বিষয় নবীস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। ইফতারে বিলম্ব না করা, সাহরী শেষ সময়ে খাওয়া, এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, ৩খ, ৩০পৃ। তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি।

৫.হাজ্জাজ ইবনে হাসসান র. বলেন,

سمعت أبا مجلز أو سألته قال : قلت كيف يصنع قال : يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. (٣٩٦٣)

অর্থ: আমি আবূ মিজলায র. (বিশিষ্ট তাবেয়ী)কে বলতে শুনেছি, অথবা হাজ্জাজ বলেছেন, আমি আবূ মিজলায র.কে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে হাত বাঁধবো? তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬৩। এর সনদ সহীহ।

৬. ইবরাহীম নাখায়ী র. (যিনি তাবেয়ী ছিলেন) বলেন,

يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة . أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٦٠

অর্থ: নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬০ । এর সনদ হাসান।

আল্লামা ইবনুল মুনযির র. তার আল আওসাত গ্রন্থে লিখেছেন,

وقال إسحاق: تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع.-

অর্থাৎ ইসহাক (যিনি বুখারী র. এর উস্তাদ ছিলেন) বলেছেন, নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের নিকটতর। (৩খ,২৪৩পৃ)

একটি খারাপ অভ্যাস

লা-মাযহাবী আলেমদের একটি খারাপ অভ্যাস হলো - অন্যদের দলিল-প্রমাণের খুব খবর নেন। নিজেদের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন। অনেক সময় সাধারণ মানুষ এতে ধোঁকায় পড়ে যান। আরেকটি কাজ তারা করেন। একটি হাদীস যদি পাঁচটি কিতাবে এসে থাকে- যদিও তার সনদ একটিই হয়ে থাকে- তারা এটিকে পাঁচটি হাদীস হিসেবে দেখিয়ে থাকেন। বুখারী শরীফের বাংলা

^ List

অনুবাদের টীকায় তারা বুকে হাত বাঁধার তিনটি হাদীসকে পাঁচটি নম্বরে উল্লেখ করেছেন। আবার মুরসাল হাদীসকে তারা প্রামাণ্য মনে করেননা। কিন্তু প্রয়োজনে মুরসালকেও প্রমাণ-স্বরুপ পেশ করেন। যাহোক, এখানে তাদের দলিলগুলোর অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি। এক কথায় আমরা মনে রাখতে পারি, বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই।

১. হযরত ওয়াইল রা. এর হাদীস (সহীহ ইবনে খুযায়মা, ১/২৪৩) , এটি সহীহ নয়। এর সনদে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল আছেন। তিনি সুফইয়ান ছাওরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। মুয়াম্মালকে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, আমি যাকে মুনকারুল হাদীস বলবো, তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে না। তাছাড়া ইবনে সা'দ, আবূ যুরআ রাযী, আবূ হাতেম রাযী, ও দারাকুতনী প্রমুখ তাকে 'অত্যধিক ভুলের শিকার' আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে মাঈন এক বর্ণনায় বলেছেন, সুফয়ানের ক্ষেত্রে তিনি প্রমাণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত নন। মুহাম্মদ ইবনে নসর বলেছেন, তিনি কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হলে ভেবে চিন্তে দেখতে হবে, কেননা তিনি প্রচুর ভুলের শিকার ছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানীও ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, সুফইয়ান হতে মুয়াম্মালের বর্ণনায় দুর্বলতা আছে। (দ্র, ৯খ, ২৮৮পৃ, ৫১৭২ হাদীসের অধীনে)

২. তাউসের বর্ণনাটি আবূ দাউদ (৭৫৯) শরীফে আছে, এটি মুরসাল। আর মুরসাল (সূত্র বিচ্ছিন্ন)কে তারা প্রামাণ্য মনে করেননা। তদুপরি এতে সুলায়মান ইবনে মূসা নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে বুখারী র. বলেছেন, عنده مناكير তার বর্ণনায় অনেক আপত্তিকর বিষয় আছে। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, ليس بالقوي তিনি মজবুত রাবী নন। (দ্র, যাহাবীর আল কাশিফ)।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসটি বায়হাকীতে আছে। এটির সনদে রাওহ্ ইবনুল মুসায়্যাব আছে, তিনি চরম দুর্বল রাবী। ইবনে হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন, তার থেকে হাদীস নেওয়া বৈধ হবেনা। ইবনে আদী বলেছেন, أحاديثه غير محفوظة তার হাদীস সঠিক নয়। (দ্র, তাহযীবুত তাহযীব) ।

৪. হযরত আলী রা. এর হাদীসটি বুখারী র. এর তারীখে কাবীরে আছে।

<u>এই হাদীসটির ব্যাপারে তিনটি আপত্তি আছে:</u>

এক, হযরত আলী রা. থেকে যিনি এটি বর্ণনা করেছেন, তার নাম নিয়ে বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যুহায়র (عقبة بن ظهير), হাম্মাদ ইবনে সালামা তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যাবয়ান (عقبة بن ظبيان), আর আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী র. বলেছেন উকবা ইবনে সাহবান(عقبة بن صهبان)। আবার উকবা থেকে এটি কে বর্ণনা করেছেন তা নিয়েও দ্বিমত আছে। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ বলেছেন আসিম আল জাহদারীর নাম। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেছেন আসিমের পিতার নাম। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটাকে সনদের এযতেরাব বলা হয়, যা একটি হাদীস দুর্বল প্রমাণিত হওয়ার অন্যতম কারণ। দ্র, ইলালে দারাকুতনী, ৪ক, ৯৯পৃ; আল জারহু ওয়াত তা'দীল লি ইবনি আবী হাতিম, ৬খ, ৩১৩পৃ।

দুই, হযরত আলী রা. থেকে এহাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী হাতেম আল জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা আছে, 'বুকের উপর' (على الصدر) কথাটি নেই। একইভাবে ইবনে আবী শায়বা র.ও মুসান্নাফে এটি উল্লেখ করেছেন, সেখানেও বুকের উপর কথাটি নেই। দ্র, হাদীস নং ৩৯৬২।

তিন, ইমাম বুখারী র. তার আততারীখুল কাবীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে সমর্থন করেননি, বরং সেটি উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وقال قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة من أصحاب علي عن علي رضـــ : وضعها على الكرسوع. ٦/٤٣٧

অর্থাৎ কুতায়বা র. হুমায়দ ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে আবুল জা'দ থেকে, তিনি আসিম জাহদারীর সূত্রে হযরত আলী রা. এর ছাত্র উকবা থেকে, তিনি হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার হাত কব্জির উপর রাখলেন। (দ্র, ৬খ, ৪৩৭পৃ)

এসব কারণে আল্লামা ইবনে কাছীর র. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাওছারের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

^ List

৫. হযরত হুলব রা. এর হাদীসটি মুসনাদে আহমদে (৫/২২৬) আছে। সুফইয়ান হতে শধু ইয়াহয়াই বুকের উপর হাত বাঁধার কথাটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদে ওয়াকী র., দারাকুতনীতে ওয়াকী ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী র. দুজন সুফইয়ানথেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে সুফয়ানের সঙ্গী আবুল আহওয়াস একই উস্তাদ 'সিমাক' থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তাদের কারো বর্ণনাতেই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। সুতরাং এটি শায হাদীস, যা গ্রহনযোগ্য নয়।

আল্লামা নিমাবী র. আছারুস সুনান গ্রন্থে লিখেছেন,

ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه فيناسبه قوله: وصف يحي اليمنى على اليسرى فوق المفصل صـــ ٨٧ ويوافقه سائر الروايات

অর্থাৎ আমার মনে হয়, অনুলেখকের ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে। সঠিক হবে على صدره (বুকের উপর) এর স্থলে على هذه (এই হাতের উপর)। [এ হিসেবে হাদীসটির অর্থ দাঁড়ায়- এই হাতটি এই হাতের উপর রেখেছেন- অনুবাদক]। এতে এটি পরের কথার সঙ্গেও মিলে যায়। কারণ পরে বলা হয়েছে, ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে দেখিয়েছেন, আর এটি তখন অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার স্যাথেও সংগতিপূর্ণ হয়। (দ্র, পৃ ৮৭)

এ হিসেবে এই হাদীসটি হানাফীদের দলিল হয়ে যায়। এখানে লক্ষ্য করুন, একটি দলিলও তাদের সহীহ নেই। পক্ষান্তরে আমাদের ১ ও ৫ নং হাদীস দুটি সহীহ। ৬ নং হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী র. এর যুগে ও তাঁর পূর্বে বুকে হাত বাঁধার প্রচলন ছিলনা

ইমাম তিরমিযী র. হযরত হুলব রা. এর হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন,

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة

ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم

অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের আমল ছিল এ হাদীসের উপর । তাঁরা মনে করতেন, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করতেন নাভির উপরে রাখবে, আর কেউ কেউ মনে করতেন নাভির নীচে রাখবে। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটিরই অবকাশ আছে।

লক্ষ্য করুন, সাহাবী, তাবেয়ী ও তিরমিযী র.এর যুগ পর্যন্ত আলেমগণকে তিনি দুভাগ করেছেন। এক ভাগের মত ছিল নাভির নীচে হাত বাঁধা, আরেক ভাগের মত ছিল নাভির উপরে হাত বাঁধা। বুকের উপর হাত বাঁধার আমল কোথায়? তিরমিযী র.ও কি আহলে হাদীস ছিলেন না? একইভাবে ইবনুল মুনযির র.ও তাঁর আল আওসাত গ্রন্থে উপরোক্ত দুধরণের আমল ও মতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, হাত বাঁধার যে সহীহ নিয়ম পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, সে নিয়মে হাত বাঁধলে বুকের উপর রাখা প্রায় অসম্ভব।

আরেকটি কথা, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা যেভাবে হাত বাঁধেন, তাতে বুকের উপরে বাঁধা হয়না, হয় বুকের নীচে। আমি তাদের একজনকে বিষয়টি বলেছিলাম। তিনি আমার সামনে হাত বেঁধে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। শেষে বললেন, এটাতো কখনোই চিন্তা করিনি। আমি বললাম, এবার চিন্তা করুন। হাদীস বলবেন বুকের উপর হাত বাঁধার, আর আমল করবেন বুকের নীচে হাত বাঁধার, তা হয়না।

প্রসঙ্গ: ছানা পড়া

ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম আহমাদ র. দুজনেরই মত হলো - নামাযে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার পর এভাবে ছানা পড়া উত্তম:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

এমতের পক্ষে প্রমাণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১.আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, وسبح بحمد ربك حين تقوم অর্থ: যখন তুমি দাঁড়িয়ে যাবে, তখন তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।(সূরা তূর,৪৮)

যাহহাক র. বলেছেন, উক্ত আয়াতের মর্ম হলো নামাযে এই ছানা পাঠ করা:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ৮খ. ৩০পৃ.।

ইমাম তিরমিযী র. লিখেছেন, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم অর্থাৎ তাবেয়ীন ও অন্যান্য আলেমগণের অধিকাংশের আমল হলো- এই ছানা পাঠ করা।

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أخرجه النسائي(٨٩٩،٩٠٠) والترمذي (٢٤٢) وأبو داود (٧٧٥) وابن ماجه(٨٠٤)، كلهم من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عنه.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় বলতেন, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ৮৯৯,৯০০; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪২; আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৭৫; ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং ৮০৪। এ হাদীসটি সহীহ।

৩. হযরত আয়েশা রা. বলেন,

^ List

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عنها، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه قاله الترمذي (٢٤٣) وأخرجه أبو داود من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عنها(٧٧٦)

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪৩; আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৭৬। আবূ দাউদের সনদ বা সূত্রকে আল্লামা আহমাদ শাকের র. তিরমিযী শরীফের টীকায় সহীহ বলেছেন।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

كان رسول الله يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك وكان عمر يعلمنا ويقول كان رسول الله يقوله. أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٢٦)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, আমরা যখন নামায শুরু করি, তখন যেন বলি,

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও এমনটি করতেন। তিনি আমাদেরকে শেখাতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এভাবে বলতেন। তাবারানী, আল-আওসাত, হাদীস নং ১০২৬। এর সনদ সহীহ।

৫. হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন,

عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٠٣٩) والدارقطني : ١٠/٣٠٠، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله مؤثقون. ٢٢٨/٢

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন الله أكبر বলতেন তখন উভয় কান বরাবর হাত উঠাতেন। আর বলতেন,

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

তাবারানী, আল-আওসাত, হাদীস নং ৩০৩৯। হায়ছামী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

৬. আবদা র. থেকে বর্ণিত:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. أخرجه مسلم(٣٩٩) باب حُجَّةِ مَنْ قَالَ لاَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ. ورواه الدارقطني وفيه: يسمعنا ذلك ويعلمنا، ٣٠١/١

অর্থ: হযরত উমর রা. এই কালিমাগুলো উচ্চস্বরে পড়তেন

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ و تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

মুসলিম শরীফ, হাদীস নং(৩৯৯)

দারাকুতনী র.ও এটি উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে একথাও আছে, তিনি আমাদেরকে শোনাতেন এবং শেখাতেন। ১ খ, ৩০১ পৃ,।

ইমাম মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া র. তাঁর মুনতাকাল আখবার গ্রন্থে লিখেছেন,

وجهر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه وهذا يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم غالبا

অর্থাৎ হযরত উমর রা. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে কখনো কখনো মানুষকে শেখাবার জন্যে উচ্চস্বরে এই ছানা পাঠ করতেন। অথচ সুন্নত হলো ছানা অনুচ্চস্বরে পড়া। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামাযে এই ছানা পড়াই উত্তম। এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই ছানা পাঠ করতেন। (২খ, ২১২পৃ)

৭. ইবনে জুরায়জ র. বলেছেন,

حدثني من أصدق عن أبي بكر ، وعن عمر ،وعن عثمان ، وعن ابن مسعود : أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

অর্থ: আবু বকর রা. উমর রা. উছমান রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি সত্যবাদী মনে করি।তাঁরা যখন নামায শুরু করতেন, তখন পড়তেন:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২৫৫৮, তাবারানী, আল-কাবীর, হাদীস নং ৯১৯৮।

আল্লামা শাওকানী র. নায়লুল আওতার গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম সাঈদ ইবনে মানসূর র. তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক রা.ও এই ছানা পড়তেন। দারাকুতনী র. হযরত উছমান রা. সম্পর্কে এবং ইবনুল মুনযির র. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। (দ্র, ২খ, ২১১পৃ)

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম র. 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এই ছানা পাঠ করা উত্তম হওয়ার দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেটিও দেখতে পারেন।

মুকতাদী সূরা ফাতেহা পড়বেনা

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইমামের পেছনে মুকতাদী সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়বেনা । এর প্রমাণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো –

১.আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "

অর্থ: আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয় ।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য তাফসীরে তাবারী (৯খ. ১০৩পৃ.) ও তাফসীরে ইবনে কাসীরে (২খ. ২৮পৃ.) এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " يعني في الصلاة المفروضة.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রা. وإذا قرئ القرآن সম্পর্কে বলেছেন– এটি ফরজ নামাযের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর মতও তাই। তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে–

صلى ابن مسعود، فسمع أناسا يقرءون مع الامام، فلما انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا ؟ أما آن لكم أن تعقلوا ؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ রা. নামায পড়ছিলেন, তখন তিনি কতিপয় লোককে ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়তে শুনলেন। নামায শেষে তিনি বললেন – তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি, তোমাদের কি বোঝার সময় হয়নি? যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। (৯ খ. ১০৩ পৃ.)

যায়দ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া র. বলেছেন–

كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

অর্থাৎ কিছু লোক ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন, তখন অবতীর্ণ হয়

{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন–

أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة

অর্থাৎ এবিষয়ে সকলেই একমত যে, উক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (আল মুগনী, ১খ.৪৯০ পৃ.)

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী র. বলেছেন–

وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الامام وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه، وفي الخطبة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله (ص)، أنه قال: إذا قرأ الامام فأنصتوا، وإجماع الجميع على أن من سمع خطبة الامام ممن عليه الجمعة، الاستماع والانصات لها الخ

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঠিক ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি হলো যারা বলেছেন, নামাযে কুরআনে কারীম মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । ইমাম যখন কেরাত পড়বেন তখন তার পেছনে যারা একতেদা করবে তারা সেটা শ্রবণ করবে । আর খুতবার ক্ষেত্রেও তা-ই। এটিকে আমরা সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এজন্য বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে: যখন ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা নীরব থাকবে । আর খুতবার ব্যাপারে সকলে একমত যে, যাদের উপর জুমআ ফরজ তারা যখন ইমামের খুতবা শুনবে তাদেরকেও নিশ্চুপ থাকতে হবে। (দ্র.প্রাগুক্ত)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. লিখেছেন,

في قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} . مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن

المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأنه يستمع له وينصت.

التمهيد ١١ /٣٠-٣١

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এ বাণী {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} দ্বারা সকল আলেমের ঐকমত্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো ফরজ নামায, এতে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, ইমাম যখন নামাযে জোরে কেরাত পড়বেন তখন মুকতাদীরা কিছুই পড়বেনা, বরং কান পেতে শুনবে ও চুপ থাকবে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ . قِيلَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ جَهْرِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ يَسْمَعُ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ . وَقِيلَ : بَلْ يَجُوزُ الْأَمْرَانِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ . وَيُرْوَى هَذَا عَنْ الأوزاعي وَأَهْلِ الشَّامِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : بَلْ الْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ . وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } قَالَ أَحْمَد : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ .

অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলিমগণের তিনটি মত রয়েছে। এক, কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়বেন আর মুকতাদী তা শুনবে তখন সে কোন অবস্থাতেই কেরাত পড়তে পারবেনা। সূরা ফাতেহাও না, অন্য কোন সূরাও না। পূর্বসুরী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। ইমাম মালিক র., ইমাম আহমাদ র. ও ইমাম আবূ হানীফা র. প্রমুখের মাযহাবও তাই। আর ইমাম শাফেয়ী র. এর দুটি মতের একটিও অনুরূপ। অতঃপর অন্য দুটি মত উল্লেখ করার পর ইবনে তায়মিয়া র. আরও বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }

^ List

অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবন কর এবং নীরব থাক। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন, আয়াতটি সকলের মতে নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এ আয়াতে দুটি আদেশ এসেছে। এক, মনোযোগ দিয়ে শোনা। দুই, নীরব থাকা। এই আদেশ দুটি তখনই পালিত হবে যখন মুকতাদী ইমামের সঙ্গে কেরাত না পড়বে। এখন যদি ইমাম জোরে কেরাত পড়ার সময় কোন মুকতাদী নিজেও কেরাত পড়ে, তবে দুটি আদেশই সে লঙ্ঘন করলো। আর যদি ইমাম আস্তে কেরাত পড়ার সময় মুকতাদীও পড়ে তবে সে ২য় আদেশটি অমান্য করলো।

২. হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. বলেছেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وإذا قرأ فأنصتوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا. أخرجه مسلم باب التشهد في الصلاة (٤٠٤) من طريق جرير عن سليمان التيمي عن قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىِّ عنه. وليس سليمان متفردا فيه بل تابعه عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عند الدارقطني والبيهقي، وأبو عبيدة مجاعة بن الزبير العتابي الأزدي أحد الثقات عند أبي عوانة.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে বয়ান দিলেন, আমাদেরকে দীনের পথ বুঝিয়ে দিলেন এবং নামায শিখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন নামায শুরু করবে তখন কাতার ঠিক করে নেবে।

^ List

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে ইমাম বানাবে। ইমাম যখন তাকবীর দেবে তোমরাও তখন তাকবীর দেবে। আর যখন সে কেরাত পড়বে, তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। সে যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পড়বে, তোমরা তখন আমীন বলবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। অতঃপর সে যখন আল্লাহু আকবার বলবে এবং রুকু করবে তোমরাও তখন আল্লাহু আকবার বলবে এবং রুকু করবে। কারণ ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকুতে যায়। আবার তোমাদের পূর্বেই রুকু থেকে উঠে পড়ে। এতে তার ও তোমাদের রুকুতে অবস্থান সমানই হলো। অতঃপর সে যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তোমরা তখন বলবে اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ । আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রশংসা শুনবেন। কেননা তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন। আর যখন সে তাকবীর দেবে এবং সেজদা করবে তখন তোমরাও তাকবীর দেবে এবং সেজদা করবে।

মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪০৪; আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৯৭৩; ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ৮৪৭; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ, ৪১৫ পৃ; মুসনাদে বাযযার, (দ্র, নাসবুর রায়াহ, ২খ, ১৫পৃ); সহীহ আবূ আওয়ানা, ২খ, ১৩২পৃ।

ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে জারীর তাবারী র. প্রমুখ এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, এটি সহীহ হাদীস।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْه. وتابع أبا خالد محمد بن سعد الأشهلي أحد الثقات عند النسائي (٩٢٣) والدارقطني ٣٢٧/١ وتابعه أيضا محمد بن ميسر الصاغاني عند أحمد ٣٧٦/٢.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম নিয়োগ করার উদ্দেশ্য তাকে অনুসরণ করা । সুতরাং সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। আর যখন কেরাত পড়বে, তখন তোমরা নীরব থাকবে।

যখন সে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।

আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৬০৪; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ৯২২-৯২৩; ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং ৮৪৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৮২০; মুসনাদে আহমদ, ২খ, ৩৭৬ পৃ; দারাকুতনী, ১খ, ৩২৭পৃ।

ইমাম মুসলিম র. বলেছেন, هو عندي صحيح আমার দৃষ্টিতে এটি সহীহ। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং, হাদীস নং ৪০৪।

উল্লেখ্য, এই হাদীসটির শুরুতে বলা হয়েছে, إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ইমাম নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো তাকে অনুসরণ করা। এ বাক্যটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা রা. (হাদীস নং ৬৮৮) ও হযরত আনাস রা. (হাদীস নং ৩৭৮) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ বাক্যটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুকতাদী নীরব থাকবে। কেননা কুরআন পাঠকালে অনুসরণ কিভাবে করা হবে সে প্রসঙ্গে সূরা কিয়ামায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) অর্থাৎ আমি যখন পাঠ করি আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এই 'অনুসরণ' শব্দটির ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে: استمع له وأنصت (হাদীস নং ৫) অর্থাৎ কুরআন পাঠকালে অনুসরণ করার অর্থ হলো কান পেতে শোনা এবং নীরব থাকা। সুতরাং কেরাত পড়ার সময় ইমামকে অনুসরণ করার অর্থও হবে তাই। এতটুকু কথা থেকে বিষয়টি বোঝা গেলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট করে এই দুই ও তিন নং হাদীসে বলে দিয়েছেন, ইমাম যখন কেরাত পড়বে তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ হতো তবে তিনি এখানেই স্পষ্ট করে বলে দিতেন।

স্মর্তব্য, হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম নাসায়ী র. যে অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করেছেন, সে অনুচ্ছেদটি হলো: باب، تأويل قوله عز و جل { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

^ List

অর্থ: অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী -যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। এই অনুচ্ছেদে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন এটি মূলত: উক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা। হাদীসটিতে যে কথা বোঝানো হয়েছে, আয়াতটিতেও তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নামাযে ইমামের কেরাতের সময় মুকতাদীকে চুপ থাকতে হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

..... أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ . فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». أخرجه مسلم في باب التسميع والتأمين (٤١٠) من طريق قُتَيْبَة بْنِ سَعِيدٍ عن يَعْقُوبَ– يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْه. وقريب منه ما رواه البخاري بلفظ إذا أمن القاري فأمنوا فإن الملائكة تؤمن (٦٤٠٢) وأخرجه ابن ماجه في باب الجهر بآمين من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه نحو رواية مسلم (٨٥٢)

অর্থ: কুরআন পাঠ কারী (অর্থাৎ ইমাম) যখন বলে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ এবং যারা তার পেছনে, তারা (মুকতাদীরা) বলে আমীন, যার আমীন বলা আসমান বাসী (ফেরেশতা) দের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪১০।

ইমাম বুখারী র.ও স্বীয় সহীহ গ্রন্থে (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৪০২) হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন- কুরআন পাঠকারী যখন আমীন বলবে, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকে। ইমাম ইবনে মাজা র.ও হাদীসটি মুসলিম শরীফের অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।(দ্র, হাদীস নং ৮৫১-৮৫২)।

মুসলিম শরীফের হাদীস ও ইবনে মাজা'র অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে জামাতের নামায সম্পর্কেই হাদীসটি বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ইমামকেই কারী অর্থাৎ কুরআন পাঠকারী বলে অভিহিত করেছেন। বোঝা গেল, নামাযে কুরআন পাঠ করা ইমামেরই কর্তব্য। যদি ইমাম ও মুকতাদী সবার জন্যে কুরআন পাঠের বিধান থাকতো তবে শুধু ইমামকে এ বিশেষণে উল্লেখ করা হতো না।

৫. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

.... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري (٧٨٢)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে, তোমরা তখন আমীন বলো। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং৭৮২।

এই হাদীস থেকেও বোঝা যায়, মুকতাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবেনা। কারণ, এক, মুকতাদীরা সূরা ফাতেহা পাঠে ব্যস্ত থাকলে ইমাম কখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়ছেন সকলের পক্ষে তা খেয়াল রাখা সম্ভব হবেনা। ফলে যথাসময়ে আমীন বলাও হয়ে উঠবেনা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে মুকতাদীকে ইমামের غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলার প্রতি খেয়াল রাখতে বলবেন, অপরদিকে সূরা ফাতেহা পাঠের আদেশ দিয়ে তাকে ব্যস্ত করে রাখবেন, এমনটা হতে পারেনা। দুই, যে মুকতাদী নামায শুরুর কিছুক্ষণ পর এসে শরীক হল, সে যদি সূরা ফাতেহা পাঠ শুরু করে দেয়, আর ইতিমধ্যেই ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে ফেলেন, তবে সেই মুকতাদী কি করবে? যদি সে তার পড়াই চালু রাখে তাহলে ইমামের সঙ্গে তার আমীন বলা হলোনা। অথচ এ হাদীসে তাকে ইমামের সঙ্গে আমীন বলতে বলা হয়েছে। আর যদি সে তার পড়া বন্ধ করে দিয়ে ইমামের সঙ্গে আমীন বলে, এরপর অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে তবে তার আমীন 'মোহর' হবেনা। অথচ আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে (হাদীস নং ৯৩৮) আমীনকে মোহরের ন্যায়

(مثل الطابع على الصحيفة) বলা হয়েছে। তাছাড়া আমীন শব্দটি কুরআনের আয়াত নয়। তাই সূরা ফাতেহার মাঝখানে আমীন বলার অর্থ - কুরআন নয় এমন কিছুকে কুরআনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া।

৬. হযরত জাবির রা. বলেছেন,

.....عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل من كان له إمام فقراءته له قراءة. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٢٣) قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبي الزبير عنه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد بن حميد في مسنده قال : ثنا أبو نعيم ثنا الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عنه مرفوعا. قال البوصري : إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده قال: أنا إسحاق الأزرق نا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا. قال البوصري: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الإمام محمد في الموطا (صـــ٩٨) عن أبي حنيفة نا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر مرفوعا. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد عن أسود بن عامر — وهو ثقة — عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وهو إسناد صحيح أيضا. وأخرجه ابن ماجه كذلك وفي إسناده جابر الجعفي (٨٥٠)

অর্থ: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ইমাম আছে, তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত বলে গণ্য হবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৮২৩। এ সনদটি সহীহ।।

মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়দে ভিন্ন সনদে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। বূসিরী র. বলেছেন, এটি ইমাম মুসলিম র. এর শর্ত মোতাবেক সহীহ। আহমদ ইবনে মানী' র. অন্য একটি সনদে তার মুসনাদ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বূসিরী র. বলেছেন, এটি বুখারী র. ও মুসলিম র. উভয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ। দ্র, মুহাম্মদ আওওয়ামা মাদ্দা যিল্লুহু এর মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার টীকা;

^ List

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, পৃ ৯৮; মুসনাদে আহমদ, ৩খ, ৩৩৯পৃ; (এ সনদ দুটিও সহীহ)। ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ৮৫০। এতে জাবির জু'ফী রয়েছে।

এ হাদীসে মুলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে, মুকতাদীর জন্যে আলাদা করে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং ইমামের কেরাতই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। কেননা সূরা ফাতেহা হলো আল্লাহর দরবারে হেদায়াতের আবেদন। সকলের পক্ষ থেকে আবেদন একজনই পেশ করে। ইমামকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রুকু, সেজদা, তাকবীর ও তাসবীহ হলো উক্ত দরবারের আদব। এজন্যে এগুলো সকলকে পালন করতে হয়।

৭. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ». أخرجه أبو داود عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِىِّ عنه(٨٩٣) وأخرجه نحوه عبد الرزاق عن شيخ من الأنصار . ٢٨١/٢

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা সেজদায় থাকাবস্থায় যদি তোমরা নামাযে শরীক হও তবে তোমরাও সেজদা করবে। সেটাকে কিছু গণ্য করবেনা। যে ব্যক্তি রুকু পেল সে নামায (অর্থাৎ ঐ রাকাত) পেল। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ২/২৮১।

এ হাদীস থেকেও বুঝা গেল, মুকতাদীর ফাতেহা পড়ার প্রয়োজন নেই। ইমামের সঙ্গে রুকু পেলেই তার রাকাত পূর্ণ হবে।

৮. হযরত আবূ বাকরা রা. বলেছেন,

انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري (رقم ٧٨٣) وفي رواية البخاري في كتاب القراءة، والطبراني: فقال: أيكم صاحب هذا النفس قال خشيت أن تفوتني الركعة معك.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে থাকাবস্থায় তিনি এসে পৌঁছলেন। এবং কাতারে যাওয়ার পূর্বেই রুকুতে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ব্যাপারটি জানালে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এমনটি আর করো না। বুখারী শরীফ, হাদীস নং৭৮৩।

ইমাম বুখারী কিতাবুল কিরাআতে ও তাবারানী র. (দ্র, ফাতহুল বারী) একথাও উল্লেখ করেছেন যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এমন কে করেছ? তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমার এ রাকাতটি ছুটে যাওয়ার আশংকা করেছিলাম (তাই আমি এমনটি করেছি)।

এ হাদীসটি থেকে বোঝা গেল, রুকু পেলেই মুকতাদীর রাকাত পূর্ণ হয়, এবং সূরা ফাতেহা মুকতাদীর জন্যে ফরজ নয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকরা রা.কে পুনরায় নামায পড়তে বলতেন।

ইমাম বায়হাকী র. হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রা. থেকেও আবূ বাকরা রা.এর অনুরূপ ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেছেন,

وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه

অর্থাৎ এ থেকে প্রতীয়মান হয়, রুকু পেলেই রাকাত পাওয়া হয়। অন্যথায় তারা এমন তড়িঘড়ি করতেননা। সুনানে বায়হাকী, ২খ, ৯০পৃ।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে হযর যায়দ ইবনে ছাবিত রা. ও হযরত ইবনে উমর রা. উভয় থেকে এই ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে -

الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة

وإن وجدهم سجودا سجد معهم ، ولم يعتد بذلك .

অর্থাৎ নামাযে আগত ব্যক্তি যদি দেখে, জামাত রুকু অবস্থায় রয়েছে, তবে তাকবীর দিয়ে নামাযে শরীক হবে। এতে সে রাকাতটি পেয়ে যাবে। আর তাদেরকে সেজদা অবস্থায় পেলে সেজদা করবে বটে, তবে সেটাকে রাকাতরূপে গণ্য করবেনা। (দ্র, ২খ, ২৭৮ পৃ) ।

আব্দুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নাফে (২খ, ২৮১পৃ) ও ইমাম তাবারানী র. আলমুজামুল কাবীরে হযরত আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা.এর এই ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন,

من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি রুকু পেল না সে যেন সেজদা করেই সেটাকে রাকাত গণ্য না করে। হায়ছামী র. বলেছেন, رجاله موثقون এর বর্ণনাকারীগন বিশ্বস্ত। দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২খ, ১৮২ পৃ।

উক্ত দুটি গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে,

وعن زيد بن وهب قال دخلت أنا وابن مسعود المسجد والامام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ الامام قمت أقضي فقال قد أدركته . قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات .(٢/٢٨٣) وعبد الرزاق في المصنف(٢/٢٨٣)

অর্থাৎ যায়দ ইবনে ওয়াহব র. বলেন, আমি ও ইবনে মাসউদ রা. মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইমাম তখন রুকুতে ছিলেন। আমরা রুকু করে হেঁটে হেঁটে কাতারে পৌঁছলাম। ইমাম নামায শেষ করলে আমি রাকাতটি পড়বার জন্যে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি তো রাকাত পেয়ে গেছ। হায়ছামী বলেন, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ২খ, ২৮৩পৃ।

বুখারী শরীফের হাদীস ও সাহাবীগণের এসব ফতোয়ার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ আলেম এই মত পোষণ করতেন যে, যে ব্যক্তি রুকু পেল সে রাকাত পেয়ে গেল।

হাফেজ ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

والمسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة، وإن كان فيه خلاف فهو شاذ. مختصر فتاوى ابن تيمية صـــ ٥٩

অর্থাৎ জামাতে বিলম্বে অংশগ্রহণকারী যদি ফাতেহা পড়ার সময় না পায়, তবে ইমামের সঙ্গে রুকু করে ফেলবে। ফাতেহা সম্পূর্ণ করবেনা। এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত। যদিও এতে দ্বিমত রয়েছে, তবে সেটা বিচ্ছিন্ন মত। (মুখতাসারা ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, পৃ৫৯)

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী র. তাঁর ফাতহুল বারী নামক বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة . وهذا قول جمهور العلماء ، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء . وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام ، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه . وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة – في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، عن المقبري ، عنه . وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن أبي هريرة ، أنه قال : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . وهو قول عامة علماء الأمصار .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকু করতে পারল সে ঐ রাকাত পেয়ে গেল, যদিও ইমামের সঙ্গে তার কিয়াম (দাঁড়ানো) ও ফাতেহা পাঠ ছুটে গেল। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত । ইমাম ইসহাক র. (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) প্রমুখ এটাকে আলেমগণের ইজমা বা ঐকমত্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু তালিব র. এর বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদ র. (তিনিও ইমাম বুখারীর উস্তাদ) বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই। অথচ তাঁর অবগতি ছিল ব্যাপক, ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা ও পরহেজগারী ছিল চরম পর্যায়ের। এ মতই পোষণ করতেন হযরত আলী রা., ইবনে মাসউদ রা., ইবনে উমর রা. যায়দ ইবনে ছাবিত রা. ও এক বর্ণনানুসারে হযরত আবূ হুরায়রা রা. । আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক আল মাদীনী র. সাঈদ আল মাকবূরী'র সুত্রে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (দ্র. ৪খ. ২৩০ পৃ.)

লা-মাযহাবী আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'বুদূরুল আহিল্লাহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

واعتداد لاحق برکعتی کہ رکوعش دریافتہ مذہب جمہورست مگر جماعتی از اہل حق دران خلاف کردہ

^ List

অর্থাৎ রুকু পেলে যে রাকাত পাওয়া হয় এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত । তবে কিছু আলেম এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

এমনিভাবে মাওলানা শামসুল হক আজীমাবাদী (তিনিও লা-মাযহাবী আলেম ছিলেন) আবূ দাউদ শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ আওনুল মাবূদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা শাওকানী র. প্রথম দিকে এই মত পোষণ করতেন যে, রুকু পেলে মুকতাদীর রাকাত পাওয়া হয়না। কিন্তু পরে তার মতের পরিবর্তন ঘটে। 'ফাতহুর রাব্বানী ফী ফাতাওয়াশ শাওকানী' গ্রন্থে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।(দ্র, আওনুল মাবূদ, ৩খ, ১১০পৃ)।

মোট কথা, বুখারী শরীফের হাদীস, সাহাবীগণের ফতোয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের উল্লিখিত মত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফাতেহা পাঠ করা মুকতাদীর জন্যে অপরিহার্য নয়। অপরিহার্য হলে রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয়নি বলে বলা হতো।

৯. আতা ইবনে ইয়াসার র. বলেছেন,

..... أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ . أخرجه مسلم (٥٧٧) في باب سجود التلاوة. والنسائي في باب ترك السجود في النجم. (٩٦٠)

অর্থ: তিনি ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়া সম্পর্কে যায়দ ইবনে ছাবিত রা.কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, কোন নামাযেই ইমামের সঙ্গে কোন কিছু পড়বেনা। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৫৭৭।

১০. নাফে র. থেকে বর্ণিত:

.... أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. موطا مالك صـــ ٢٩

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রা.কে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, ইমামের পেছনে কেরাত পড়া যাবে কিনা? তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পেছনে নামায পড়ে তখন ইমামের কেরাতই তার জন্যে যথেষ্ট হয়। আর যখন সে

^ List

একাকী পড়ে, তখন যেন নিজেই কেরাত পড়ে। নাফে বলেন, ইবনে উমর রা. ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেননা।(মুয়াত্তা মালিক, পৃ২৯)।

১১. হযরত আবুদ্দারাদা রা. বলেছেন,

سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. أخرجه النسائي (٩٢٣) وأحمد ٦/٤٤٨ والدارقطني ١/٣٣٣ والطحاوي ١/١٥٨

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কেরাত আছে? তিনি বলেলেন, হ্যাঁ। একজন আনসারী ব্যক্তি তখন বললেন, এটা তো ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি তার সবচেয়ে কাছে ছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি মনে করি, কোন জামাতে ইমাম থাকলে সকলের পক্ষে তিনিই যথেষ্ট।

নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ৯২৩; মুসনাদে আহমদ, ৬খ, ৪৪৮ পৃ; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১৫৮ পৃ; দারাকুতনী , ১খ, ৩৩৩পৃ।

১২. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

.... أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم من أحد ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: فقال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك. أخرجه مالك في الموطا صـــ ٢٩ والترمذي (٣١٢) وقال حديث حسن و أبو داود (٨٢٦) والنسائي (٩١٩) وابن ماجه (٨٤٨-٨٤٩) وأحمد في مسنده ٢/٢٨٤

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন, যে নামাযে তিনি উচ্চস্বরে কেরাত পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি একটু পূর্বে আমার সঙ্গে কেরাত পড়েছে? তখন একজন বললেন, হ্যাঁ, আমি পড়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাইতো বলছি কুরআনের সঙ্গে আমার টানাটানি হচ্ছে কেন? লোকেরা যেদিন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনলেন, সেদিন থেকে তারা সেসব নামাযে কেরাত পড়া ছেড়ে দিলেন, যেসব নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কেরাত পড়তেন।

মুয়াত্তা মালিক, পৃ,২৯; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩১২, তিনি এটিকে হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৮২৬; নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ৯১৯; মুসনাদে আহমদ,৪খ, ২৮৪ পৃ; ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং ৮৪৮,৮৪৯।

উল্লেখ্য, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কেরাত পড়ছিলেন, তাতেই তাঁর কেরাতে সমস্যা হচ্ছিল। হযরত শায়খুল হিন্দ র. বলেছেন, আস্তে কেরাতের ক্ষেত্রে তা আরো বেশী সমস্যা হওয়ার কথা।

১৩. হযরত জাবির রা. থেকে বলেছেন,

من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام.

أخرجه الترمذي (٣١٣) وقال هذا حديث حسن صحيح ومالك في الموطا صـــ ٢٨

অর্থ: যে ব্যক্তি নামাযের কোন রাকাত পড়ল, তাতে সূরা ফাতেহা পড়লনা, সে যেন নামাযই পড়লনা। তবে যদি সে ইমামের পেছনে নামায পড়ে তবে তার ব্যাপার ভিন্ন।) তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩১৩; তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। মুয়াত্তা মালিক, পৃ ২৮।

এ হাদীসে জাবির রা. স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, সূরা ফাতেহা পড়া ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারীর জন্যে আবশ্যক। মুক্তাদীর জন্যে সেটা আবশ্যক নয়। এ কথায় তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিলেন, যে হাদীসে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়েনা, তার নামাযই হয়না। হযরত বুঝিয়ে দিলেন, এ বিধানটি মুক্তাদির জন্যে নয়। ইমাম বা একা নামায আদায়কারীর জন্যে এটা বলা হয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না র. থেকেও অনুরূপ কথা উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রা. এর ঐ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ দাউদ র. বলেন,

قال سفيان : لمن يصلي وحده

^ List

অর্থাৎ সুফইয়ান র. বলেছেন, একা নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে এই হাদীস। (দ্র, হাদীস নং ৮২২) ইমাম তিরমিযী র. ইমাম আহমাদ থেকেও একই কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

واما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده

অর্থাৎ আহমাদ র. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয়না এটা তখন, যখন কেউ একা নামায পড়ে। ইমাম আহমাদ র. এক্ষেত্রে জাবির রা. এর উল্লিখিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন,

فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই কথার 'যে সূরা ফাতেহা পড়েনি তার নামায হয়নি' এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটা তার ক্ষেত্রে যে একা নামায আদায় করে।

ইমাম তিরমিযী র.ও হযরত উবাদা রা. এর হাদীসটিকে মুকতাদীর বিধান বলে মনে করতেননা। এই কারণে 'কিরাআত খালফাল ইমাম' বা মুকতাদীর জন্যে কেরাত পড়া অনুচ্ছেদে হাদীসটি উল্লেখ না করে তিনি তার একচল্লিশ অনুচ্ছেদ পূর্বে ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب অনুচ্ছেদে নামাযে ফাতেহার কি গুরুত্ব সেটা বুঝাবার জন্যে উল্লেখ করেছেন।

এখন বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত জাবির রা. ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদের উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফইয়ানইবনে উয়ায়না, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ, এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি মুকতাদীর জন্যে নয়। আর আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা বলেন, এটা মুকতাদীর জন্যেও। আমরা কার কথা মানবো?

তাছাড়া অধিকাংশ ইমাম ও আলেম যারা ইমামের পেছনে মুকতাদীর কেরাত পড়া জরুরী মনে করেতেন না, তাদেরও তো একইমত। ইমাম আহমাদ র. কত জোর দিয়ে বলেছেন,

^ List

ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه و لم يقرأ هو صلاته باطلة . المغني لابن قدامة (١/٣٣٠)

অর্থাৎ ইমাম যখন কেরাত পড়ে, তখন তার পেছনে মুকতাদী যদি কেরাত না পড়ে তবে মুকতাদীর নামায হবেনা - এমন কথা কোন মুসলমানকে আমরা বলতে শুনিনি। এইযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, ও তাবেয়ীগণ, এই যে মদীনাবাসী ইমাম ম্যালিক, ইরাকবাসী সুফইয়ানছাওরী, শামবাসী ইমাম আওযায়ী, ও মিসরবাসী লায়ছ ইবনে সা'দ, এঁদের কেউই একথা বলেননি - ইমাম যখন কেরাত পড়বে, তখন পেছনে মুকতাদী যদি কেরাত না পড়ে তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। (ইবনে কুদামা কৃত, আল-মুগনী, ১খ, ৩৩০পৃ)।

হায় আফসোস! ইমাম আহমদ র. যা জীবনেও শুনেননি, কোন আলিম ও মুসলমান যে বিষয়ে মত দেননি, সে বিষয়ের দিকে এখন মুসলমানদেরকে জোরেশোরে ডাকা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে-এছাড়া নামাযই হবেনা। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন।

والحمد لله رب العالمين

নামাযে নিম্নস্বরে আমীন বলা সুন্নত

আমীন সম্পর্কেও কিছু লোক বাড়াবাড়ি করে। তারা বলে নামাযে আমীন জোরে বলতে হবে। আস্তে বলা সুন্নতের পরিপন্থী। তাদের একথা সঠিক নয়। হাদীস শরীফ, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী'র আমল দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমীন আস্তে বলাই সুন্নত। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী র. (মৃ.৩১১) যার রচিত তাফসীরে তাবারী ও তারীখে তাবারী গ্রন্থ দুটি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। তিনি কোন হানাফী আলেম ছিলেন না। অথচ তিনি তাঁর তাহযীবুল আছার গ্রন্থে কত সুন্দর বলেছেন,

وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبي وابراهيم التيمى كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذكان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك . (الجوهر النقى ٢/٥٨)

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রা., ইবরাহীম নাখায়ী র. শা'বী র. ও ইবরাহীম তায়মী র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা আমীন আস্তে বলতেন। সঠিক কথা হলো আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলার উভয় হাদীসই সহীহ। এবং দুটি পন্থা অনুযায়ী এক এক জামাত আলেম আমলও করেছেন। যদিও আমি আস্তে আমীন বলাই অবলম্বন করি, কেননা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এ অনুযায়ীই আমল করতেন। (দ্রঃ আল জাওহারুন নাকী, ২খ, ৫৮পৃ,)

ইবনে জারীর র. এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী'দের আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও আস্তে আমীন বলাকেই অবলম্বন করেছেন। মদীনা শরীফে ইমাম মালেক র. এর নিবাস ছিল। তাঁর মূলনীতি ছিল কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস পওয়া গেলেও মদীনাবাসীর আমল কি ছিল সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তিনিও ফতোয়া দিয়েছেন,

ويخفي من خلف الإمام آمين. المدونة-فى الركوع والسجود ١/٧١

অর্থাৎ মুকতাদী আস্তে আমীন বলবে। (দ্রঃ আল-মুদাওয়ানা, ১খ.৭১ পৃ.)

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আহমদ আদ দরদের র. লিখেছেন,

وندب الاسرار به اى بالتأمين لكل من طلب منه.

অর্থাৎ মুকতাদীর জন্য আস্তে আমীন বলাই মুস্তাহাব। এমনকি ইমাম মালেক র.ও বলেছেন যে, ইমাম আমীন বলবেই না। এমনিভাবে কূফায় পনের শত সাহাবী বসবাস করতেন। এই কূফার সাধারণ আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। ইবনে মাসউদ, তাঁর শিষ্যবর্গ, ইবরাহীম নাখায়ী, ইবরাহীম তায়মী ও শা'বী প্রমুখ কূফার বড় বড় মুহাদ্দিসগণ সকলে আমীন আস্তে বলার পক্ষপাতি ছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো ওয়াইল রা. এর জোরে আমীন বলার হাদীসটি সুফইয়ান ছাওরী রা. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুফইয়ান ছাওরী ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস অর্থাৎ হাদীস সম্রাট। অথচ তিনি নিজেও আস্তে আমীন বলার পক্ষে।

যাহোক এখানে আমরা আলোচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে চাই। এক. ইমামের আমীন আস্তে বলা। দুই. মুকতাদীর আমীন আস্তে বলা।

ইমামের আস্তে আমীন বলার দলিলঃ

عن وائل بن حجر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته.ورواه الترمذى رقم (٢٤٨) واحمد فى المسند.رقم (١٨٨٥٤) . ورواه الحاكم فى المستدرك (٢٩١٣)وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.وقال الذهبى فى التلخيص: على شرط البخاري ومسلم والطيالسى (١٠٢٤) والدارقطنى ٣٣٤/١ والبيهقى ٥٧/٢ والطبرانى فى الكبير ٤٣/٢٢رقم(١١٢،١١٠،١٠٩)

অর্থঃওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়লেন, তখন আমীন বললেন এবং আমীন বলার সময় তাঁর আওয়াযকে নিম্ন করলেন। তিরমিযী শরীফ (২৪৯); দারাকুতনী ১ম খ. ৩৩৪পৃ. বায়হাকী, খ.২ পৃ.৫৭।

এ হাদীসকে হাকেম র. সহীহ বলেছেন। যাহাবী র.ও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন। ইবনে জারীর তাবারী র.ও এটিকে সহীহ বলেছেন। পেছনে তাঁর হুবহু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। কাযী ইয়ায র.ও এটিকে সহীহ বলেছেন। (দ্র. শারহুল উব্বী, ৬খ, ৬০৮ পৃ.)

আমীন আস্তে বলার এ হাদীসটি ইমাম শো'বা র. কর্তৃক বর্ণিত। তারই সঙ্গী সুফইয়ান ছাওরী র.ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে জোরে আমীন বলার কথা এসেছে। অনেকে এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো জোরে আমীন বলেছেন। এর নজীর হলো জোহরের নামাযের কেরাআত আস্তে পড়াই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ম। কিন্তু মাঝে মধ্যে দু'একটি আয়াত তিনি জোরে বলতেন। যাতে সাহাবীগণ বুঝতে পারেন জোহরের নামাযে কোন সূরা বা কতটুকু কেরাআত পড়া সুন্নত। তেমনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো কখনো তিনি আমীন একটু জোরে বলেছেন। আর অন্য সময় আস্তে বলেছেন। এর পক্ষে সহীহ হাদীস একটু পরে আসছে।

আমীন জোরে বলার পক্ষে যেসব মুহাদ্দিস ছিলেন, তাঁরা শো'বা র. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর সুফইয়ান র. এর বর্ণিত হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং শো'বা র. এর বর্ণনার উপর কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। অন্যরা আবার এসব আপত্তির সন্তোষজনক জবাবও দিয়েছেন।১

---

১. যেহেতু আমাদের লা-মাযহাবী ভায়েরা এসব আপত্তি তাদের অনুদিত বুখারী শরীফের টীকায় উল্লেখ করেছেন, তাই সেগুলোর জবাব এখানে তুলে ধরছি। ক. প্রথম আপত্তি করা হয়েছে সনদ বা সূত্রের একটি নাম নিয়ে। সাধারণ ভাবে সুফইয়ান র. এর বর্ণনায় নামটি এসেছে হুজ্‌র ইবনুল আম্বাস। আর শো'বা র. এর বর্ণনায় এসেছে হুজর আবুল আম্বাস।

উল্লেখ্য যে, ইবনুল আম্বাস মানে আম্বাসের ছেলে, আর আবুল আম্বাস মানে আম্বাসের পিতা। আপত্তি কারীগণ বলেন, হুজর ছিলেন আসলে আবু'স-সাকান বা সাকানের পিতা।

এর জবাব হলো, হুজর র. এর পিতা ও তাঁর ছেলে দু'জনের নামই ছিল আম্বাস। আবার তাঁর আরেক ছেলের নাম ছিল সাকান। তাই এখানে ভুলের কিছুই ঘটেনি। এই কারণে আবু দাউদ শরীফে (হাদীস নং ৯৩২) এবং দারাকুতনীতে (১/৩৩) সুফয়ানের বর্ণনায় তাকে হুজর আবুল আম্বাস নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে হিববান র. তাঁর আছ্ছিকাত গ্রন্থে বলেছেন, হুজর ইবনুল আম্বাস আবুস সাকান আল কূফী هوالذى يقال له ابوالعنبس অর্থাৎ তাঁকে আবুল আম্বাসও বলা হয়। (দ্র. আছারুস সুনান) ইবনুল কাত্তান র. এবং তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে ইবনে হাজার আসকালানী আত তালখীস গ্রন্থে লিখেছেন, ان له كنيتان ، ابو السكن وابوالعنبس–অর্থাৎ তাকে আবুস সাকানও বলা হয় আবুল আম্বাসও বলা হয়।

ইবনেহাজার র. তাহযীব গ্রন্থেও লিখেছেন, (প. পৃ. দ্র.)

....

حجر بن العنبس الحضرمی ابو العنبس ويقال له ابو السکن الکوف، –অর্থাৎ হুজর ইবনুল-আম্বাস আল হাযরামী আবুল আম্বাস, আবু'স-সাকানও বলা হয়, আল কূফী।

খ. দ্বিতীয় আপত্তি হলো শো'বা র. হুজ্র ইবনুল-আম্বাসের পরে আলকামার নাম বৃদ্ধি করেছেন। অথচ সুফয়ানের বর্ণনায় হুজর র. সরাসরি হযরত ওয়াইল রা. থেকে বর্ণনা করার কথা এসেছে।

এর জবাব হলো হুজর দুভাবেই হাদীসটি শুনেছেন, আলকামার সূত্রে ওয়াইল রা. থেকে, আবার সরাসরি ওয়াইল রা. থেকে। এর নজির হাদীসে অনেক আছে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (যিনি সরাসরি শো'বার শিষ্য ছিলেন) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হুজর র. এর বাচনিক উল্লেখ করেছেন, سمعت علقمة يحدث عن وائل وسمعته من وائل، –অর্থাৎ আমি আলকামা র.কে তাঁর পিতা ওয়াইল রা. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, আবার ওয়াইল রা. থেকেও শুনেছি। শুধু তাই নয়। তাহাবী র. আবূ দাউদ তায়ালিসীর সূত্রে, আবূ মুসলিম আল কাজ্জী র. স্বীয় মুসনাদে (দ্রঃ আত তালখীসু'ল হাবীর ১/২৩৭) আমর ইবনে মারযূকের সূত্রে, এবং বায়হাকী (২/৫৮) আবূল ওলীদ তায়ালিসীর সূত্রে, তারা তিনজন (আবূ দাউদ তায়ালিসী, আমর ও আবুল ওলীদ) শো'বা র. এর সূত্রে সুফইয়ান র. এর মতই সালামা ইবনে কুহায়ল থেকে, তিনি হুজর এর সূত্রে হযরত ওয়াইল রা. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা শো'বা র. এর কোন ভুল নয়।

গ. তৃতীয় আপত্তি হলো, জোরে আমীন বলার স্থানে শো'বা আস্তে আমীন বলার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা একটা দাবী, যার পক্ষে কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই। হাকেম নিশাপুরী র., ইবনে জারীর তাবারী র., কাযী ইয়ায র. ও হাফেজ যাহাবী শো'বার বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলে উক্ত দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধিকন্তু সনদের ক্ষেত্রে শো'বার কিছু কিছু ত্রুটি এজন্যই ঘটতো যে, তিনি মতন বা হাদীসের মূল বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন বেশী। সুতরাং হাদীসের মূল বক্তব্যে তাঁর ভুলের সুযোগ কোথায়?

ঘ. চতুর্থ আরেকটি আপত্তি হলো শো'বার বর্ণনায় যে আলকামা আছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদীস শোনেন নি। তিরমিযী র. ইলালে কাবীর গ্রন্থে বুখারী র. এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, আলকামা তার পিতা থেকে শোনেন নি। তিনি তাঁর পিতার ইন্তেকালের ছয়মাস পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানী র. ও তাকরীবুত্ তাহযীবে বলেছেন, আলকামা তার পিতা থেকে শোনেন নি। এ হিসাবে শো'বার সূত্রটি বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য হয়।

এর জবাব হলো, ইলালে কাবীরের তথ্যটি ভুল। স্বয়ং ইমাম বুখারী র. তাঁর তারীখে কাবীরে বলেছেন (سمع اباه)আলকামা তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন। (দ্র. ৭খ, ১৭৮) এমনকি তিরমিযী র. নিজেও তিরমিযী শরীফে (১৪৫৪) বলেছেন, وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل ،وعبد الجبار لم يسمع من ابيه. –অর্থাৎ আলকামা ইবনে ওয়াইল তার পিতা থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়াইলের বড় ভাই। অবশ্য আব্দুল জব্বার তাঁর পিতা থেকে শোনেন নি।

ইমাম বুখারী র. এর উদ্ধৃতিতে তিরমিযী র. আলকামা র. সম্পর্কে ইলালে কাবীরে যা উল্লেখ করেছেন, সেটা আসলে আব্দুল জব্বার সম্পর্কে, আলকামা সম্পর্কে নয়। যার প্রমাণ ইমাম তিরমিযী র. নিজেই ইমাম বুখারী'র উদ্ধৃতি দিয়ে তিরমিযী শরীফে লিখেছেন,

سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه ولا ادركه . يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر.

অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী র. কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়াইল

^ List

তাঁর পিতা থেকে হাদীস শোনেন নি। এমনকি তার দেখাও পাননি। বলা হয় তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। (তিরমিযী শরীফ- ১৪৫৩)।

ইমাম বুখারী তারীখে কাবীরে আব্দুল জব্বার সম্পর্কে লিখেছেন, انه ولد بعد موت ابيه بستة اشهر. তাঁর পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন (দ্র. ৬খ, {১৮৫৫}) ইবনে হিব্বান র.ও তাঁর ছিকাত গ্রন্থে বলেছেন, আলকামা তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন। মুসলিম শরীফে আলকামার সূত্রে তাঁর পিতা থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে আলকামা বলেছেন " حدثني ابي"আমার পিতা এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (নং ১০৫৫) এমনিভাবে বুখারী র. রচিত জুযউ রাফউল-ইয়াদাইন গ্রন্থে আলকামার বাচনিক উল্লেখ রয়েছে " حدثني ابي" আমার পিতা এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। (দ্রঃ আছারু'স-সুনান, পৃ, ১২৭)।

উল্লেখ্য যে, আলকামার আপন ছোট ভাই আব্দুল জব্বার । আলকামাই যদি পিতার ছয়মাস পরে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁর ছোট ভাই কিভাবে ওয়াইল রা. এর সন্তান হবেন? তিনি কবে জন্ম গ্রহণ করলেন? যাহোক, বুখারী র., তিরমিযী র. ও ইবনে হিব্বান প্রমুখের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আলকামা তাঁর পিতা থেকে হাদীস শুনেছেন। একটি ভুল উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে লা-মাযহাবী ভাইয়েরা সেই পুরনো কথাই প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এটা ঠিক নয়।

আরেকটি কথা না বললেই নয়। নিজেদের অনুদিত বুখারী শরীফের টীকায় তাঁরা লিখেছেন, "অন্য পরেকার কথা, স্বয়ং মোল্লা আলী কারী হানাফী তদীয় মিশকাতের শরাহ মিরকাতে অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, হাদীসবিসারদগণ শো'বার এই ভুল সম্পর্কে একমত। তিনি বলেন, সর্বস্বীকৃত সঠিক কথা হচ্ছে 'মাদ্দা বিহা সাওতাহু ও রাফাআ বেহা সাওতাহু' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীনের শব্দ দারাজ করে পড়লেন এবং উচ্চ কণ্ঠে পড়লেন"। এ হলো হুবহু তাদের বক্তব্য। এতে অনুমিত হয় তাঁরা মিরকাত খুলেও দেখেন নি। কিংবা মিরকাতের বক্তব্য বোঝেন নি। অথবা বুঝেও তা গোপন করেছেন। অনুবাদে কিছু ঝামেলার কথা বাদ দিলেও ঐ বক্তব্যটি আসলে মোল্লা আলী কারী র. এর নিজের নয়। তিনি বক্তব্যটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, قاله متروك وفيه ما فيه، অর্থাৎ মীরাক শাহ এ কথা বলেছেন, তার এতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। (২খ. ৫২৭ পৃ.)

লক্ষ্য করুন! বক্তব্যটি একজনের। কারী সাহেব এতে আপত্তি থাকার কথা বলেছেন। এরই নাম কি অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করা? কারী সাহেব তো এর পরের পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

قلت مع أن الأصل في الدعاء الإخفاء لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية الأنعام ولا شك أن آمين دعاء فعند التعارض يرجح الإخفاء بذلك وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية ولأن آمين ليس من القرآن إجماعا فلا ينبغي أن يكون على صوت القرآن كما أنه لا يجوز كتابته في المصحف انتهى.

অর্থাৎ আমি বলবো, দোয়ার ক্ষেত্রে আসল নিয়ম হলো নিঃশব্দে বলা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "তোমরা বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে তোমাদের রবের নিকট দোয়া কর"। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমীন একটি দোয়া। সুতরাং হাদীসের পরস্পর বিরোধিতার সময় উক্ত কারণে এবং অন্যান্য যিকির ও দোয়ার উপর কিয়াস করার দ্বারা নিঃশব্দে আমীন বলাই প্রাধান্য লাভ করবে। অধিকন্তু আমীন শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের অংশ নয়। তাই কোরআনের আওয়াযের মতো আওয়ায করে আমীন বলা উচিৎ হবে না। একই কারণে এটি কোরআনে কারীমে লিপিবদ্ধ করাও জায়েয নেই। মিরকাত ২/৫২৮

২.হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত–

قال : سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد قتلنا لقتادة ما هاتان السكتتان ؟ فقال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال. وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.اخرجه الترمذى(٢٥١) واللفظ له وابوداود (٧٨٠) واحمد ٢٣/٥

অর্থাৎ হাসান বসরী র. হতে বর্ণিত। সামুরা রা. বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি সাকতা (নিরবতা) স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এটা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমরা তো একটি সাকতা স্মরণ রেখেছি। পরে আমরা মদীনা শরীফে উবায় ইবনে কা'ব রা. এর নিকট পত্র লিখলাম। তিনি লিখে পাঠালেন যে, সামুরা সঠিক স্মরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদা র. কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দুটি সাকতা কোথায় কোথায় ছিল? তিনি বললেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে প্রবেশ করতেন। আর যখন কিরাআত পাঠ সমাপ্ত করতেন। এরপর কাতাদা বলেছেন, যখন ولا الضالين পাঠ শেষ করতেন। তিনি আরো বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পছন্দ ছিল, যখন তিনি কেরাত পাঠ সমাপ্ত করতেন তখন শ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নিরব থাকতেন।

তিরমিযী শরীফ (২৫১); আবূ দাউদ শরীফ (৭৮০); মুসনাদে আহমদ, (৫খ,২৩ পৃ,)।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দু'সময় নিরব থাকতেন। প্রথম নিরবতা তাকবীরে তাহরীমার পর। এসময় তিনি নিঃশব্দে ছানা পড়তেন। দ্বিতীয় নিরবতা সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর। এ সময় "আমীন" বলতেন। বোঝা গেল আমীন নিঃশব্দে বলতেন।

হাদিসটিতে কাতাদা প্রথমতঃ বলেছিলেন ২য় নিরবতা হতো কেরাত শেষ করার পর। পরে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, কেরাত শেষ করা মানে সূরা ফাতেহার কেরাত শেষ করা। আর সম্পূর্ণ কেরাত শেষ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু নিরব থাকতেন যাতে শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এটা সামান্য নিরবতা হতো। আবূ দাউদ শরীফে (৭৭৯) কাতাদা র. হতে সাঈদে'র সূত্রে ইয়াযীদ র. এর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে –

سكتة اذاكبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولاالضالين.

^ List

অর্থাৎ একটি সাকতা হতো তাকবীরে তাহরীমার পর, আরেকটি সাকতা হতো غير المغضوب عليهم ولاالضالين. বলার পর। দারাকুতনী র. ও ইবনে উলায়্যা থেকে, তিনি ইউনুস ইবনে উবায়দের সূত্রে হাসান বসরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। {দ্রঃ ১ম খ, ৩৩৬পৃ, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩(২০৫৩০)} ।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন– ذكر ما يستحب ان يسكت سكتة اخرى عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب. অর্থাৎ সূরা ফাতেহা শেষ করার পর দ্বিতীয় বার নীরব থাকা মুস্তাহাব।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী র., যার তাহকীক ও গবেষণার উপর লা-মাযহাবীদেরও বেশ আস্থা আছে, তিনি তাঁর যাদুল মায়াদ গ্রন্থে লিখেছেন–

وَقَدْ صَحّ حَدِيثُ السّكْتَتَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو حَاتِمٍ فِي " صَحِيحِهِ " وَسَمُرَةُ هُوَ ابْنُ جُنْدُبٍ وَقَدْ تَبَيّنَ بِذَلِكَ أَنّ أَحَدَ مَنْ رَوَى حَدِيثَ السّكْتَتَيْنِ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَقَدْ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إذَا كَبّرَ وَسَكْتَةً إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالّينَ وَفِي بَعْضِ طُرُقِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ وَهَذَا كَالْمُجْمَلِ وَاللّفْظُ الْأَوّلُ مُفَسّرٌ مُبَيّنٌ.انتهى.(١/٧٩)

অর্থাৎ সামূরা রা. উবায়্য ইবনে কা'ব রা. ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে সহীহ সনদে দুই সাকতার হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস আবূ হাতিম {ইবনে হিব্বান র.} তাঁর "সহীহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সামূরা রা. হলেন ইবনে জুনদুব। এ থেকে স্পষ্ট যে, সামূরা ইবনে জুনদুব রা.ও দুই সাকতার হাদীসটি বর্ণনা কারীদের একজন। তিনি তাঁর হাদীসে বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুটি সাকতার কথা স্মরণ রেখেছি। একটি হলো তিনি যখন তাকবীর দিতেন । অপর টি হলো তিনি যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالّينَ পড়ে শেষ করতেন। কোন কোন বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ; তিনি যখন কেরাত শেষ করতেন, তখন নিরব থাকতেন। এই বর্ণনাটি অস্পষ্ট। প্রথম বর্ণনাটি ব্যাখ্যা-সম্বলিত ও সুস্পষ্ট। (দ্রঃ, ১ম; ৭৯ পৃ,)।

৩.হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন–

قَالَ رَسُولُ اللَّه :إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ فَانه مَنْ وَافَقَ قوله قول الْمَلاَئِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه .ورواه البخارى برقم -٧٨٢ باب جهر المأمومين بالتأمين ومسلم (٤١٠)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলে শেষ করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাগণের আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭৮২; মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪১০

মুসলিম শরীফে আবূ মুসা আশআরী রা. এর বর্ণিত হাদীসেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ.

অর্থাৎ ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলে শেষ করবে, তোমরা তখন আমীন বলবে। (হাদীস নং- ৪০৪)।

এ দুটি হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় ইমাম আমীন নিঃশব্দে বলবে। অন্যথায় এভাবে বলা হতো না যে, ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলবে, তোমরা তখন আমীন বলবে। বরং বলা হতো, ইমামকে যখন আমীন বলতে শুনবে তখন তোমরা আমীন বলবে। বিশেষ করে নাসাঈ শরীফে আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটিতে সহীহ সনদে একথাও বর্ণিত আছে যে–

فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ.

অর্থাৎ কেননা ফেরেশতারাও এসময় আমীন বলে, ইমামও আমীন বলে।

(হাদীস নং ৯২৭)।

ইমামও এসময় আমীন বলে কথাটি তখনই বলা চলে যখন ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলে। ফেরেশতাগণ যেমন নিঃশব্দে আমীন বলার কারণে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসময় ফেরেশতাগণ আমীন বলে। তদ্রুপ ইমামও নিঃশব্দে বলার কারণে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসময় ইমামও আমীন বলে।

^ List

তাছাড়া এই হাদীসে ফেরেশতাগণের আমীন বলার সঙ্গে মিল রেখে আমীন বলতে বলা হয়েছে। আর তাঁরা তো নিঃশব্দে আমীন বলে থাকেন। সুতরাং পুরোপুরি মিল তখনই হবে যখন মুকতাদীও নিঃশব্দে আমীন বলবে।

৪. উমর রা. এর ফতোয়া:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُخْفِي الإِمَامُ أَرْبَعًا – : التَّعَوُّذُ، وَ بسم الله الرحمن الرحيم وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. المحلى لابن حزم ٢٨٠/٢

অর্থ: আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেন, উমর রা. বলেছেন, ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ। (আল মুহাল্লা, ২/২৮০)।

৫. ইবনে মাসউদ রা. এর ফতোয়া:

عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُخْفِي الإِمَامُ ثَلاثًا الاسْتِعَاذَةُ، وَ بسم الله الرحمن الرحيم وَآمِينَ. . المحلى لابن حزم ٢٨٠/٢

অর্থ: ইমাম তিনটি কথা নিঃশব্দে বলবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন। (আল মুহাল্লা, ২/২৮০)।

৬. ইবরাহীম নাখায়ী র. এর ফতোয়া:

عن حماد عن إبراهيم قال أربع يخفيهن الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والإستعاذة وآمين وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد. عبد الرزاق- ٢٥٩٦ وابن ابى شيبة فى المصنف-برقم ٤١٥٩

অর্থ: হাম্মাদ {আবু হানীফা র. এর খাস উস্তাদ ছিলেন} র. ইবরাহীম নাখায়ী র. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম চারটি কথা নিঃশব্দে বলবে, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক (২৫৯৬); মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা (৪১৫৯)।

৭. উমর রা. ও আলী রা. এর আমল:

عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين.رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١/١٥٠

অর্থ: আবূ ওয়াইল র. হতে বর্ণিত। উমর রা. ও আলী রা. বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও আমীন স্বশব্দে পড়তেন না। (তাহাবী শরীফ ১/১৫০)

৮. ইবনে মাসউদ রা. এর আমল:

عن أبي وائل قال كان علي و ابن مسعود لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين. رواه الطبراني في الكبير-٩٣٠٤.وفي هذين الاثرين أبو سعد البقال، قال البخارى فيه مقارب الحديث كما فى علل الترمذى الكبير. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد١٠٨/٢ وهو ثقة مدلس.

অর্থ: আবূ ওয়াইল র. বলেন, আলী ও ইবনে মাসউদ র. বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও আমীন স্বশব্দে পড়তেন না। তাবারানী, আল কাবীর (৯৩০৪); মুসান্নাফে ইবনে আবীশায়বা, (৪১৬০)।

৯. ইবরাহীম নাখায়ী র. এর আমল:

عن مغيرة عن ابراهيم انه كان اذا كبر سكت هنيهة ، واذا قال غيرالمعضوب عليهم ولا الضالين سكت هنيهة.رواه عبد الرزاق برقم-٢٨٥٨

অর্থ: মুগীরা র. বলেন, ইবরাহীম নাখায়ী র. তাকবীর দিয়ে কিছু সময় নিরব থাকতেন। আবার যখন غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين পড়তেন তখনও কিছু সময় নিরব থাকতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক (২৮৫৮)।

জোরে আমীন বলা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছিল

এমন কোন সহীহ হাদীস নেই, যেখানে স্পষ্টভাবে ইমামকে জোরে আমীন বলতে বলা হয়েছে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জোরে আমীন বলেছেন, সে সম্পর্কেও সুফইয়ান ছাওরী র. এর সূত্রে বর্ণিত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন সহীহ হাদীস নেই।

সুফইয়ান ছাওরীর হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জোরে আমীন বলার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা ছিল শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। হযরত ওয়াইল রা. ছিলেন ইয়ামানের নবাব খান্দানের মানুষ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা শরীফে হাজির হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামাযে নিজের পেছনে প্রথম কাতারে জায়াগা করে দেন। যাতে করে তিনি দেখে দেখে নামায শিখতে পারেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন নামাযে জোরে আমীন বলেছেন। এটা তাঁর সাধারণ নিয়ম ছিল না। সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকলে তা শুধু ওয়াইল কেন, অন্যান্য সাহাবীর অনেকেই বর্ণনা করতেন। অথচ দারাকুতনীতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে– هذه سنة تفرد بها اهل الكوفة অর্থাৎ এই সুন্নতটি কেবল কূফাবাসীদের সূত্রেই বর্ণিত।

জোরে আমীন বলা যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল তার প্রমাণগুলি নিম্নরূপ:

ক.হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন–

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم دخل فى الصلاة ، فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال آمين ثلاث مرات.رواه الطبرانى فى الكبير ١٦/١٨ وقال الهيثمى : رجاله ثقات.

অর্থ: আমি দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করলেন। তিনি যখন সূরা ফাতিহা শেষ করলেন তখন তিনবার আমীন বললেন, তাবারানী, আল কাবীর ১৬/১৮ আল্লামা হায়ছামী র. বলেছেন, এর বর্ণনা কারীগণ বিশ্বস্ত।

এ হাদীস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আস কালানী র. বলেছেন–

الظاهر انه رآه فى ثلاث صلوات فعل ذلك. لا انه ثلث التأمين. حكاه الزرقانى فى شرح المواهب ١١٣/٧

তিনবার আমীন বলার অর্থ এই নয় যে, এক রাকাতেই তিনবার আমীন বলেছেন। বরং এর অর্থ হলো তিন নাময়ে তিনবার আমীন বলেছেন। তার মানে তিনি তিন নমাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমীন বলতে শুনেছেন। বাকি নামাযে শোনেন নি। অথচ এ যাত্রায় তিনি বিশ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে অবস্থান করেছিলেন।

খ. নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় হযরত ওয়াইল রা. বলেন–

وفى رواية النسائى قال وائل رضــ : فلما قرأ غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته وانا خلفه. رقم-٩٣٢

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين পড়ে শেষ করলেন তখন আমীন বললেন। আমি যেহেতু তাঁর পেছনেই ছিলাম তাই সেটা আমি শুনতে পেলাম। নাসায়ী শরীফ (৯৩২)।

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায়, তাঁকে শেখানোর উদ্দেশ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন শব্দটি ইষৎ জোরে উচ্চারণ করেছিলেন।

গ. অপর বর্ণনায় হযরত ওয়াইল রা. বলেন–

وفى رواية ابى بشر الدولابى فى الاسماء والكنى قال وائل رضــ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلاة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب. وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته ما اراه الا ليعلمنا. قال النيموى : وفيه يحى بن سلمة ، قواه الحاكم وضعفه جماعة.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের সালাম ফেরানোর সময় আমি তাঁর ডান গাল ও বাম গাল দেখেছি। আর তিনি غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়ার পর লম্বা আওয়াযে আমীন বললেন। আমার মনে হলো আমাদেরকে শেখাবার জন্যই তিনি এমন করেছিলেন। (দ্র.হাফেজ আবূবিশর আদ দূলাবী র. রচিত 'আল আসমা ওয়াল কুনা', ১ম খ, ১৯৭ পৃ.)

ঘ. হযরত ওয়াইল রা. কূফায় বসবাস করতেন। কূফার সাধারণ আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। ওয়াইল রা., তাঁর দুই ছেলে আলকামা ও আব্দুল জব্বার এবং অন্যান্য শাগরেদদের কেউ জোরে আমীন বললে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো। কিন্তু এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না । এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জোরে আমীন বলাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ধরে নিয়েছেন।

ঙ. হযরত ওয়াইল রা. উক্ত হাদীসটি সুফইয়ান ছাওরী র. এর সূত্রে বর্ণিত। তাঁকে নিয়ে তাঁরা খুব মাতামাতি করেন। তাঁর ফজিলত বলে বলে শো'বার

বর্ণনার উপর তাঁর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ সুফইয়ান ছাওরী নিঃশব্দে আমীন বলতেন। তার মানে তিনিও নিজের বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমীন জোরে বলাকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই হয়েছিল বলে ধরে নিয়েছিলেন। (দ্র. আল মুহাল্লা লি ইবনে হাযম, ২য় খ. ২৯৫পৃ.)

ইবনে মুনযির (মৃত্যু ৩১৮ হি.) আল আওসাত গ্রন্থে বলেছেন –

وقال سفيان الثورى : فاذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل آمين تخفيها.

অর্থৎ সুফইয়ান ছাওরী র. বলেন, তুমি যখন সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করবে তখন নিঃশব্দে আমীন বলবে, (দ্র ৩য় খ, ২৯৫পৃ,)।

মুকতাদীর আস্তে আমীন বলার দলিল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ছিলেন। তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলেও মাঝে মধ্যে জোরে আমীন বলার প্রমাণ তাঁর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকতাদীকে জোরে আমীন বলতে বলেছেন, কিংবা তাঁর পেছনে সাহাবীগণ জোরে আমীন বলেছেন। এই কারণে ইমাম আবূ হানীফা র., ইমাম মালেক র. ও সুফইয়ান ছাওরী র. প্রমুখ বলেছেন, মুকতাদীরা আস্তে আমীন বলবে। ইমাম শাফেয়ী র. এ সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস না পাওয়ার কারণে তাঁর পূবের্র মত পাল্টিয়ে বলেছেন, মুকতাদী আমীন আস্তে বলবে। পেছনে আমাদের পেশকৃতদলিলগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইমাম আমীন আস্তে বলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাধারণ ভাবে আমীন আস্তেই বলতেন। ঐ দলিলগুলি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মুকতাদীরাও আমীন আস্তে বলবে। সাহাবীগণের আমল ও ফতোয়াও ছিল তদ্রূপ। এ সম্পর্কে আরেকটি দলিল নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন–

كَانَ رَسُولُ اللّه –صلى الله عليه وسلم– يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّر فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اخرجه مسلم فى الصحيح (٤١٥)

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শেখাতেন। তিনি বলতেন, ইমামের পূর্বে কিছু করো না। যখন ইমাম তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ পড়ে শেষ করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। ইমাম যখন রুকু করবে তোমরাও তখন রুকু করবে। আর যখন سمع الله لمن حمده বলবে, তোমরা তখন বলবে اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪১৫।

এ হাদীসে তিনটি নির্দেশ এসেছে, তোমরা তাকবীর বলবে, তোমরা আমীন বলবে, তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। প্রথম ও তৃতীয়টি সকলের মতে নিঃশব্দে পড়তে হবে। হাদীসটির বর্ণনাধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় নির্দেশটিও নিঃশব্দে পালন করবে।

জোরে আমীন বলার হাদীস : একটু পর্যালোচনা।

জোরে আমীন বলা সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে মূল কথা হলো, যেটি সহীহ, সেটি সুস্পষ্ট (صريح) নয়। আর যেটি সুস্পষ্ট সেটি সহীহ নয়। যেমন:

১.বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে اذا امن الامام فامنوا হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ বাক্যটির একটি অর্থ হলো, ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলো। এ অর্থে ইমাম বুখারীসহ অনেকেই এটি দ্বারা ইমামের জোরে আমীন বলা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমতঃ হাদীসটির শুধু একটি অর্থই নয়, আরো অর্থ হতে পারে। হাদীসতো রাসূল বলে গেছেন, কিন্তু এর অর্থ তিনি কারো কানে কানে বলে যাননি। ইমাম মালেক র. বংশগত ভাবেই আরবী ভাষী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মতে ইমাম আমীনই বলবে না। তিনি এই হাদীসটির অর্থ করেছেন, ইমাম যখন আমীন বলার স্থানে পৌঁছবে, তখন তোমরা আমীন বলবে। আরবী ভাষায় এমন ব্যবহারের নজিরও আছে। মালেকী মাযহাবের গ্রন্থাবলিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আবার অনেকে হাদীসটির অর্থ করেছেন, ইমাম যখন আমীন বলতে ইচ্ছে করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। যেহেতু ইমাম, মুকতাদী ও ফেরেশতার আমীন বলা এক সঙ্গেই হওয়া কাম্য। ইমাম যখন আমীন বলতে চাবে তখন যদি মুকতাদী আমীন বলে তবেই একসঙ্গে হওয়া সম্ভব। অন্যথায় ইমামের আমীন বলা শুনে যদি মুকতাদী আমীন বলতে যায় তবে একসঙ্গে বলা হবে না।

^ List

এদুটি অর্থে হাদীসটি জোরে আমীন বলার কোন প্রমাণই হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি প্রথম অর্থটিই ধরা হয়, তবুও জোরে আমীন বলার ব্যাপারে এর নির্দেশনা সুস্পষ্ট নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে যখন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসময় ইমামও আমীন বলে, তখন ইমাম যখন আমীন বলে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে সূরা ফাতেহা শেষ করে ইমামতো আমীন বলবে, এসময় তোমরাও আমীন বলবে। এই কারণেই বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালেক ইত্যাদি গ্রন্থে এ হাদীসের শেষে ইবনে শিহাব যুহরী র. এর একথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এসময় আমীন বলতেন। প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হর-হামেশাই জোরে আমীন বলতেন তবে যুহরী র. কে একথা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলো কেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এসময় আমীন বলতেন?

২. আবূ হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদীস দারাকুতনীর সুনান গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেহা শেষ করে উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। এটি সহীহ নয়। এর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে উছমান সমালোচিত রাবী। তাঁর উস্তাদ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম যুবায়দী দুর্বল রাবী ছিলেন। আবূ দাউদ র. ও নাসাঈ র. তাঁকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। হিম্‌সের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আওফ আত্‌তায়ী র. তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাকেম র. মুস্তাদরাক গ্রন্থে এটিকে সহীহ এবং দারাকুতনী র. সুনান গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিলেও ইলাল গ্রন্থে দারাকুতনী র. এর সনদে ও মতনে এখতেলাফ উল্লেখ করে বলেছেন। والمحفوظ عن الزهرى اذا امن الامام فأمنوا অর্থাৎ আবূ হুরায়রা রা. থেকে যুহরী র. এর সঠিক বর্ণনাটি হলো ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও তখন আমীন বলো। (দ্র.আছারুস-সুনান,পৃ. ১২১,১২২)

৩. ইবনে উমর র. হতে দারাকুতনীর সুনানে পূর্বোক্ত বক্তব্যের মতোই আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। (দ্র, ১ম খ, ৩৩৫পৃ,) এর সনদে একজন বর্ণনাকারী আছেন বাহর আস সাক্কা (بحر السقاء), দারাকুতনী র. হাদীসটি উল্লেখ করে নিজেই বলেছেন, বাহর আস সাক্কা যঈফ।

৪. হযরত আলী রা. থেকে এ মর্মে একটি হাদীস সুনানে ইবনে মাজা'য় উদ্ধৃত হয়েছে। সেটিও যঈফ। এর সনদে মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা আছেন তিনি যঈফ ও দুর্বল।

৫. আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সুনানে ইবনে মাজা'য় উদ্ধৃত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেহা শেষ করার পর এমনভাবে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের লোকেরা তা শুনে ফেলতো, ফলে মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো।

এ হাদীসটিও সহীহ নয়। এর সনদে আবূ হুরায়রা রা. এর চাচাত ভাই আছেন, যার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানা যায় না। তাঁর শাগরেদ বিশর ইবনে রাফে অত্যন্ত যঈফ বা চরম দুর্বল। ইবনে হিব্বান র. তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন يروى الموضوعات كأنه المتعمد لها : অর্থাৎ তিনি জ্বাল হাদীস বর্ণনা করতেন, মনে হয় যেন তিনিই এগুলির আবিস্কারক। আবূ দাউদ শরীফেও একই সূত্রে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। তবে সেখানে "ফলে মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো কথাটি নেই"।

৬. উম্মুল হুসাইন (ام الحصين) রা. থেকে মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইতে এবং তাবারানীর আল কাবীরে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হয়েছে তিনি মহিলাদের কাতারে থেকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমীনের আওয়ায শুনতে পেয়েছেন। এ হাদীসটিও সহীহ নয়। এর সনদে ইসমাঈল ইবনে মুসলিম মক্কী আছেন, তিনি যঈফ বা দুর্বল।

৭. আতা র. থেকে বায়হাকী র. উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দু'শো সাহাবীকে পেয়েছেন যারা ইমামের সূরা ফাতেহা শেষে জোরে আমীন বলতেন।

এ হাদীসটিও সহীহ নয়। কেননা হাসান বসরী র. ছিলেন আতার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু তিনিও একশো বিশজনের বেশী সাহাবীর দেখা পাননি। মুজাহিদ র. এর অবস্থাও তাই। তাহলে আতা কি করে দেখাও পেলেন আবার তাদের জোরে আমীন বলাও শুনলেন। অধিকন্তু আতা র. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন খালেদ ইবনে আবী আইয়্যুব। তিনি মাজহুল বা অজ্ঞাত-অখ্যাত বর্ণনাকারী। মাজহুল ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা সুন্নত

একাধিক হাদীস ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল একথা প্রমাণ করে যে, নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা সুন্নত। রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা সুন্নত নয়।

সাহাবীগনের যুগে মদীনা শরীফ এবং কুফা এই দুটি শহরেই অধিকাংশ সাহাবী বসবাস করতেন। কুফা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পাঁচশ সাহাবীসহ পনেরশত সাহাবী অবস্থান করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনশত সাহাবী ছিলেন, যারা বায়আতে রেযওয়ানে শরীক ছিলেন এবং সত্তরজন সাহাবী এমন ছিলেন, যারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।(মুকাদ্দমা নাসবুর রায়াহ দ্রষ্টব্য)

তাঁদের মধ্যে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.ও ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযে অনেক স্থানে হাত তুলতে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী রা.ও ছিলেন, যারা অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে প্রথম কাতারেই নামায আদায় করেছিলেন। হযরত আলী রা.ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাধিক স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। এই দুই নগরীর আমল আমাদের সামনে রাখতে হবে।

<u>মদীনা শরীফের আমল:</u>

ইমাম মালিক র. -যিনি **মদীনা** শরীফের বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন- তিনি **বলেছেন,,**

لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة. (المدونة الكبرى صـــ ١/٧١)

অর্থাৎ নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোন তাকবীরের সময়, ঝোঁকার সময় বা **সোজা** হওয়ার সময় হাত তোলার নিয়ম আমার জানা নেই। (আল **মুদা**ওয়ানাতুল কুবরা, ১খ, ৭১পৃ)

^ List

কূফা নগরীর আমল:

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর (মৃত্যু ২৯৪ হি.) বলেছেন,

لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة فكلهم لا يرفع إلا في الحرام. (التعليق الممجد صـــ ٩١)

আমরা কূফাবাসী ছাড়া আর কোর শহর সম্পর্কে জানি না, যারা সকলে মিলে নামাযে ঝোঁকার সময় ও সোজা হওয়ার সময় হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন। কূফাবাসী সকলে শুধু তাহরীমার সময় হাত তুলতেন। (মুয়াত্তা মুহাম্মদের টীকা, পৃ. ৯১)

লক্ষ্য করুন, সকলে মিলে ছেড়েছেন এমন শহর শুধু কূফাই ছিল। তার মানে অন্যান্য শহরে ছেড়ে দেয়ারও লোক ছিল, হাত তোলারও লোক ছিল।

চিন্তা করুন, কূফার পনেরশ' সাহাবীর কেউ যদি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তুলতেন, তাহলে তাঁদের শাগরেদদের কেউ না কেউ অবশ্যই হাত তুলতেন। কিন্তু না, তাঁদের কেউই হাত তোলেননি। ইমাম তিরমিযীও হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর একবার হাত তোলার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন,

وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

অর্থাৎ এ হাদীস অনুসারেই মত দিয়েছেন একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী । সুফইয়ানছাওরী ও কূফাবাসীদের মতও এই হাদীস অনুসারে।

সুফইয়ানছাওরীর জীবনী পড়ুন। তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' বা হাদীসের সম্রাট উপাধি দেওয়া হয়েছে। রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণিত থাকলে তিনি তা ছেড়ে দিতেন না। ইমাম মালিক র. ও ছিলেন হাদীসের সম্রাট। মুয়াত্তায় তিনি রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও মদীনা শরীফের অধিকাংশের আমল তদনুযায়ী না থাকার কারণে তিনিও হাত না তোলাকেই অবলম্বন করেছেন। মদীনা ও কূফার এ সকল সাহাবী ও তাবেয়ী একারণেই তো রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে হাত তুলতেননা যে- তাঁদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে তেমনটা করলেও অধিকাংশ সময় তা করেননি। কিংবা পূর্বে করেছেন বটে, পরে ছেড়ে দিয়েছেন। যা হোক, ভূমিকা স্বরূপ একথাগুলো আরজ করার পর এ বিষয়ের হাদীসগুলো তুলে ধরছি।

১. আলকামা র. বলেন,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أول مَرَّة. أخرجه أبو داود (٧٤٨) والترمذي (٢٥٧) والنسائي (١٠٥٨) وقال الترمذي : حديث حسن وصححه ابن حزم في المحلى ٨٨/٤ وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوا في تعليله ليس بعلة.

অর্থ: আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায পড়বনা? একথা বলে তিনি নামায পড়লেন, এবং তাতে শুধু প্রথম বারই হাত তুলেছিলেন। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৪৮, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৫৭, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ১০৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৬, মুসনাদে আহমদ, ১খ, ৩৮৮পৃ।

ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন, ইবনে হাযম জাহিরী (যিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করতেননা) এটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী শরীফের টীকায় শায়খ আহমদ শাকের (তিনি জামে আযহারের শিক্ষক ও মিসরের কাজী ছিলেন) বলেছেন, এ হাদীসটিকে ইবনে হাযমসহ অনেক হাফেজে হাদীস সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আসলেও এটি সহীহ হাদীস। অনেকে এর যেসব ক্রটির কথা বলেছেন সেগুলো বাস্তবে কোন ক্রটি নয়।

আহমদ শাকের র, যে ক্রটির প্রতি ইংগিত করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো; কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বলেছেন

.و لم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة.

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রা. এর এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথমবারই হাত তুলেছেন। এর জবাব এই যে, ইবনে মাসউদ রা. থেকে এ ব্যাপারে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি মৌখিক

^ List

বর্ণনারূপে, অপরটি নিজে আমল করে দেখানোর মাধ্যমে। ইবনুল মুবারক র. প্রথমটি সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন। উপরে উদ্ধৃত তার বক্তব্য থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বর্ণনা সম্পর্কে তিনি ঐ মন্তব্য করেননি। এর প্রমাণ তিনি নিজেই দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীস নং ১০২৬।

২. হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. أخرجه أبو داود (٧٥٢) وابن أبي شيبة (٢٤٥٥) والطحاوي جـــ ١ وعبد الرزاق في المصنف (٢٥٣٠) والدارقطني (٢٢) فرواه عن البراء ثقتان عدي ين ثابت عند الدارقطني وعبد الرحمن بن أبي ليلى عند غيره وعنهما يزيد بن أبي زياد والحكم بن عتيبة وعيسى والحكم وعيسى ثقتان ويزيد صدوق عند البخاري ومسلم وصحح حديثه الترمذي (١١٤،٧٧٧) وعن يزيد ابن أبي ليلى والسفيانان وشريك و اسرائيل واسماعيل بن زكريا والإمام أبو حنيفة وغيرهم.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন। এরপর আর কোথাও হাত তুলতেননা।

আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং৭৫২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৫, তাহাবী শরীফ, খ১।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترفع الأيدي في سبعة مواطن، افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٥) موقوفا والطبراني (١٢٠٧٢) مرفوعا.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাতটি জায়গায় হাত তুলতে হবে। ১. নামাযের শুরুতে, ২. কাবা শরীফের সামনে আসলে, ৩. সাফা

^ List

পাহাড়ে উঠলে, ৪. মারওয়া পাহাড়ে উঠলে। ৫. আরাফায় ৬. মুযাদালিফায় ৭. হাজরে আসওয়াদের সামনে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬৫(সাহাবীর বক্তব্যরূপে)। তাবারানী, মুজামে কাবীর(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যরূপে) নং ১২০৭২। সুনানে বায়হবাকী, ৫খ, ৭২-৭৩ পৃ। হায়ছামী র. হযরত ইবনে উমর রা. থেকেও মারফূরূপে এটি উল্লেখ করেছেন।(দ্র, ২খ, ২২২ পৃ)

৪. হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ». أخرجه مسلم (٤٣٠)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, ব্যাপার কি? তোমাদেরকে দেখছি বেয়াড়া ঘোড়ার লেজের মতো করে হাত ওঠাও। নামাযে স্থির থাক। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪৩০।

উল্লেখ্য, হযরত জাবির রা. থেকেই সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে সালামের সময় হাত তুলে ইশারা করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে অসন্তুষ্টির উল্লেখ বিদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে এই বেয়াড়া উটের লেজ তোলার সঙ্গে তাদের হাত তোলাকে তুলনা করা হয়েছে। এই কারণে কেউ কেউ আলোচ্য হাদীসটিকেও 'সালামের সময় হাত তোলা সম্পর্কে' মনে করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, দুটি হাদীসের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু এক নয়। এ দুটির সনদ বা সূত্রও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন:

ক. এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবীগণ একা একা নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাদেরকে দেখে ঐ কথা বলেছিলেন। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে জামাতে নামায পড়েছিলেন।

খ. এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নামাযে হাত তোলার কারণে। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন হাত তোলার কারণে নয়, ডানে-বামে হাত দিয়ে ইশারা করার কারণে।

^ List

গ. এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে শান্ত ও স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অপর হাদীসটিতে সালাম ফেরানোর পদ্ধতি শিখিয়েছেন। (দ্র, নাসবুর রায়াহ)।

৫. হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولابين السجدتين.

أخرجه الحميدي في مسنده من طريق سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه. وسنده صحيح. ٢٧٧/٢ رقم ٦١٤.

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত ওঠাতেন। আর যখন রুকু করতে চাইতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন, তখন হাত ওঠাতেননা, দুই সেজদার মাঝখানেও না।

হুমায়দী (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) তাঁর মুসনাদে এটি উদ্ধৃত করেছেন। ২খ, ২৭৭ পৃ, (হাদীস নং ৬১৪)। এর সনদ সহীহ।

৬. হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.

رواه البيهقي في الخلافيات من حديث محمد بن غالب ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا عبد الله بن عون الخراز ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال الحافظ مغلطائي: لا بأس بسنده. وقال الشيخ عابد السندي: هذا الحديث عندي صحيح لا محالة رجاله رجال الصحيح.(راجع- الإمام ابن ماجه وكتابه السنن صــ ٢٥٢) قلت: ويؤيده أيضا عمل ابن عمر على وفقه كما عند الطحاوي ١١٠/١ وابن أبي شيبة (٢٤٦٧) والبيهقي في المعرفة عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. وأخرجه الإمام محمد في الموطا عن محمد بن أبان بن صالح عن عبد

العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة و لم يرفعهما فيما سوى ذلك.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এর পর আর করতেননা। (বায়হাকী, আল খিলাফিয়াত) । হাফিজ মুগলতাঈ র. বলেছেন, এর সনদে কোন সমস্যা নেই। শায়খ আবেদ সিন্ধী র. বলেছেন, আমার দৃষ্টিতে এটি অবশ্যই সহীহ। ইমাম মালিক র. থেকে ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহব র. একবার হাত ওঠানোর যে বর্ণনা পেশ করেছেন, যা আল মুদাওয়ানা'য় বিদ্ধৃত হয়েছে, তা এই বর্ণনার সমর্থন করে। এমনিভাবে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদীসটি এবং তাঁর আমলও এর সমর্থক।

ইবনে আবী শায়বা র. স্বীয় মুসান্নাফে ও তাহাবী র. শরহে মাআনিল আছার গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত ইবনে উমর রা. এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি নামাযের সূচনায় ছাড়া আর কোথাও হাত তোলেন নি। এর সনদ সহীহ। ইমাম মুহাম্মদ র.ও মুয়াত্তায় হযরত ইবনে উমর রা.এর অনুরূপ আমলের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

৭. আসওয়াদ র. বলেছেন,

رأيت عمر بن خطاب رض يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٩) والطحاوي ١/١١١ وصححه الزيلعي وقال الحافظ ابن حجر في الدراية : وهذا رجاله ثقات. وقال الماردييني في الجوهر النقي ٢/٧٥: هذا سند صحيح على شرط مسلم.

অর্থ: আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন; পরে আর তুলতেন না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬৯; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১১১পৃ।

যায়লাঈ র. এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আদদিরায়া গ্রন্থে লিখেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত। আল্লামা আলাউদ্দীন মারদীনী র. আল জাওহারুন নাকী গ্রন্থে বলেছেন, এটি মুসলিম শরীফের সনদের মত শক্তিশালী।

ইমাম তাহাবী এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

وفعل عمر رضي الله عنه هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه علي ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه

অর্থাৎ উমর রা. এই আমল এবং সাহাবীগণের তার উপর কোন আপত্তি না করা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এটাই এমন সঠিক পদ্ধতি, যার ব্যতিক্রম করা কোন ব্যক্তির জন্যে উচিৎ নয়।

৮. আসিম ইবনে কুলায়ব র. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

أن عليا رضـــ كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد. أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٥٧ والطحاوي ١/١١٠ والبيهقي ٢/٨٠ صححه الزيلعي وقال الحافظ في الدراية : رجاله كلهم ثقات وقال العيني : صحيح على شرط مسلم.

অর্থ: হযরত আলী রা. নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন। এরপর আর কোথাও তুলতেন না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৭; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১১০পৃ। যায়লাঈ র. এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আদদিরায়া গ্রন্থে লিখেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত। আল্লামা আইনী র. বলেছেন, এটি মুসলিম শরীফের সনদের মানসম্পন্ন।

ইমাম তাহাবী র. এটি উল্লেখ করার পর বলেন,

فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত তুলতে দেখেও তার ইন্তেকালের পর হযরত আলী রা.তো শুধু একারণেই হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন যে, তার দৃষ্টিতে হাত তোলার বিধানটি রহিত বলে প্রমাণিত ছিল।

^ List

৯. ইবরাহীম নাখায়ী র. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

أنه كان يرفع يديه في أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٨) والطحاوي ١/١١١ وعبد الرزاق ٢/٧١ وإسناده صحيح.

অর্থ: তিনি নামায শুরু করার সময় হাত তুলতেন। পরে আর কোথাও হাত তুলতেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৮; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১১১পৃ; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ২খ, ৭১পৃ। এটির সনদ সহীহ।

১০. হযরত আব্বাদ ইবনুয যুবায়র রা. থেকে বর্ণিত:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيئ حتى يفرغ. أخرجه البيهقي في الخلافيات. كما في نصب الراية ١/٤٠٤

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন শুধু নামাযের শুরুতেই উভয় হাত তুলতেন। এর পর নামায শেষ করা পর্যন্ত আর কোথাও হাত তুলতেননা। বায়হাকী তার 'আল-খিলাফিয়াত' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সকলেই বিশ্বস্ত।

১১. আবূ ইসহাক সাবিয়ী র. বলেন,

كان أصحاب عبد الله رض وأصحاب علي رض لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ثم لا يعودون. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح جدا (٢٤٦١)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ এবং হযরত আলী রা. এর শাগরেদগণ কেবল মাত্র নামাযের শুরুতে হাত ওঠাতেন। ওয়াকী র. বলেন, এর পর আর হাত ওঠাতেন না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬১। এর সনদ অত্যন্ত সহীহ।

^ List

রফয়ে ইয়াদাইন কত জায়গায় ছিল

সহীহ হাদীসসমূহে দেখা যায়, রফয়ে ইয়াদাইন একবার থেকে শুরু করে প্রত্যেক ওঠানামায় ছিল। খোদ হযরত ইবনে উমর রা. এর হাদীসে এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

ক. শুধু এক জায়গায় অর্থাৎ নামাযের শুরুতে। যেমনটি পেছনের হাদীসগুলো থেকে জানা গেল।

খ. দুই জায়গায়, অর্থাৎ শুরুতে এবং রুকু থেকে ওঠার পর। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে ইমাম মালিক র. মুয়াত্তায় এটি উদ্ধৃত করেছেন। আবূ দাউদ হযরত ইবনে উমর রা. থেকে(৭৪২), ইবনে মাজা র. হযরত আনাস রা. থেকে (৮৬৬)।

গ. তিন জায়গায়, অর্থাৎ নামাযের শুরুতে এবং রুকুর পূর্বে ও পরে। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বুখারী ও মুসলিমসহ অনেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

ঘ. চার জায়গায়, অর্থাৎ উপরোক্ত তিন জায়গায় এবং দুরাকাত শেষ করে দাঁড়ানোর সময়। ইবনে উমর রা. থেকে বুখারী (৭৩৯), আবূ দাউদ(৭৪৩)। আবূ হুমায়দ রা. থেকে ইবনে মাজা (৮৬২) ও তিরমিযী (৩০৪), তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত আলী রা. থেকে আবূ দাউদ (৭৪৪), ইবনে মাজাহ (৮৬৪), ও তিরমিযী (৩৪২৩)। তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে আবূ দাউদ(৭৩৮)।

ঙ. পাঁচ জায়গায়, উক্ত চার জায়গা ছাড়াও সেজদায় যাওয়ার সময়। বুখারী, 'জুযউ রাফইল ইয়াদাইন গ্রন্থে' , (পৃ ২৬); এবং তাবারানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে। হায়ছামী র.বলেছেন, এর সনদ সহীহ। নাসাঈ র. মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. থেকে (১০৮৫) । এর সনদও সহীহ। ইবনে মাজাহ র. হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে (৮৬০)। আবূ ইয়ালা র. হযরত আনাস রা. থেকে (৩৭৪০)। এর সনদও সহীহ। (দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ,২/২২০)। দারা কুতনী র. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে। এর সনদও সহীহ। (দ্র, আছারুস সুনান)।

এছাড়া হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর বর্ণনায় ২য় রাকাতের শুরুতে – আবূ দাউদ (৭২৩), এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় দুই সেজদার মাঝে – আবূ দাউদ(৭৪০), নাসায়ী (১১৪৩)- রফয়ে ইয়াদাইনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চ. প্রত্যেক ওঠানামার সময়। অর্থাৎ রুকু, সেজদা, কেয়াম (দাঁড়ানো), কুউদ (বসা) এবং উভয় সেজদার মাঝখানে রফয়ে ইয়াদাইন। তাহাবী মুশকিলুল আছার গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে (৫৮৩১) । এর রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত। ইবনে মাজা র. উমায়ের ইবনে হাবীব থেকে(৮৬১) এর সনদ দুর্বল।প্রত্যেক ওঠানামায় হাত তোলার হাদীসকে ইবনে হাযম (মৃত্যু-৪৫৬হি) সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। একটু পরেই তার বক্তব্য আসছে।

সহীহ হাদীস যদি মানতে হয় তাহলে এসবগুলোর উপর আমল করতে হবে। ইবনে হায্ম জাহিরী তা-ই করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় সহী সনদে হযরত ইবনে উমর রা.এর দুই সেজদার মাঝেও রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে। এমনিভাবে হযরত আনাস রা., নাফে র., তাউস র., হাসান বসরী র., ইবনে সীরীন র. ও আইয়ুব সাখ্তিয়ানী সকলেই দুই সেজদার মাঝখানে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

(দ্র.মুসান্নাফ, ৩খ.,৫০৯পৃ. ২৮১০-২৮১৫ নং হাদীস)

হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাফয়ে ইয়াদাইন অনেক জায়গায়ই ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে একবারের মধ্যে এসে ঠেকেছে, যা পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের কারণ হলো, প্রথম দিকে নামাযে চলাফেরা, সালাম-কালাম অনেক কিছুই বৈধ ছিল। ক্রমান্বয়ে স্থিরতা ও কম নড়াচড়ার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে আসতে থাকে। হানাফীগণ মনে করেন পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, রাফয়ে ইয়াদাইনও স্থিরতার পরিপন্থী। তাই ক্রমে ক্রমে এটিকে কমানো হয়েছে। অন্যথায় হযরত আলী রা., ওয়াইল ইবনে হুজ্র রা.ও আবু মূসা আশ্আরী রা. প্রমুখ সাহাবীগণ রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল না করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। ইবনে হাযম জাহিরী আল মুহাল্লা গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন–

فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ، وَلاَ يَرْفَعُ , كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحًا لاَ فَرْضًا , وَكَانَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَذَلِكَ , فَإِنْ رَفَعْنَا صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي , وَإِنْ لَمْ نَرْفَعْ فَقَدْ صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ يُصَلِّي. المحلى ٢٣٥/٣

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক ওঠা-নামার সময় হাত তুলতেন বলে যখন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত, তখন এর সব ধরণই মুবাহ বা বৈধ হবে, ফরজ হবে না। আমরা এর যে কোন পদ্ধতি অনুসারেই নামায পড়তে পারি। আমরা যদি হাত তুলি তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে । আর যদি না তুলি তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে।(মুহাল্লা,৩খ.,২৩৫পৃ.)

হায়! যদি আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা ইবনে হাযম (তিনিও কোন মাযহাব অনুসরণ করতেন না)এর উপরোক্ত বক্তব্য গ্রহণ করে নিতেন তাহলে ফেতনা অনেকাংশেই কমে যেত।

আল্লামা ইব্নুল কায়্যিম র.(মৃত্যু-৭৫০হি.)ও তাঁর 'যাদুল-মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনুত পড়া হবে কিনা, সে প্রসঙ্গে লিখেছেন,

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنَّف فيه من فعله، ولا مَنْ تَركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات، وأنواع الأذان والإِقامة، وأنواع النسك من الإِفراد والقِران والتمتع،

অর্থাৎ এটা এমন বৈধ মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত, যে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এটা করলো এবং যে করলো না কাউকেই দোষারোপ ও নিন্দা করা যায় না। এটা ঠিক তেমনই যেমন নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তদ্রুপ তাশাহহুদ বিভিন্ন শব্দে পড়া,আযান-ইকামাতের বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করা, এবং হজ্জের তিনটি নিয়ম-ইফরাদ,কিরান ও তামাত্তু বিষয়ে মতানৈক্যের মতোই।

সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু, পরে হাত, তারপর চেহারা রাখা সুন্নত

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন –

رَأَيْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وحسنه الترمذي.

অর্থ- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি যখন সেজদায় যেতেন তখন হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন। আর যখন সেজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৮৩৮; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬৮; নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ১০৮৯; ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ৮৮২; ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৬২৬; ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৯০৯ ও ইবনুস সাকান (দ্র. আছারুস সুনান,পৃ. ১৪৮) তিরমিযী বলেছেন এটি হাসান গারীব ।

২. হযরত আনাস রা. বলেন,

عن أنس رض قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة. وقال البيهقي : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول.

অর্থ– আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি তাকবীর দিয়ে সেজদায় গেলেন এবং হাত রাখার আগে হাঁটু রাখলেন । দারাকুতনী, হাকেম ও বায়হাকী । (দ্র. আছারুস সুনান, পৃ. ১৪৭)

৩. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন,

كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٢٨) وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان.

অর্থ: আমরা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম। পরে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, হাতের পূর্বে হাঁটু রাখবে। সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৬২৮।

৪. আসওয়াদ র. বলেন,

أن عمر كان يقع على ركبتيه . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧١٩)

অর্থ: হযরত উমর রা. হাঁটু দিয়েই সেজদায় যেতেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৭১৯।

তাহাবী র. আলকামা ও আসওয়াদ র. দুজনের সূত্রেই হযরত উমর রা. এর এই আমল উল্লেখ করেছেন। সেখানে একথাও আছে, তিনি হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন।

৫. নাফে র. হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন,

كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٢٠)

অর্থ: তিনি যখন সেজদায় যেতেন, তখন হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন। আর যখন সেজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠাতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৭২০।

উক্ত গ্রন্থে মুসলিম ইবনে ইয়াসার র. ইবরাহীম নাখায়ী র., আবূ কিলাবা র., ইবনে সীরীন র., ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর সকল শাগরেদের আমলও অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।(দ্র, ২৭২১-২৭২৬)

বিশেষ জ্ঞাতব্য:

হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার কোন সহীহ হাদীস নেই। হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর হাদীসটিকে তিরমিযী র. 'গরীব' বলেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান সম্পর্কে বুখারী র. বলেছেন,

لا يتابع عليه وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا

অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ তার মতো করে বর্ণনা করেনা। তিনি আরো বলেছেন, আমি জানিনা, তিনি আবুয যিনাদ থেকে শুনেছেন কিনা। ইবনুল কায়্যিম র. এই হাদীসকে 'মাকলূব' (উল্টো) আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'এটা আসলে হবে, হাত

^ List

রাখার পূর্বে যেন হাঁটু রাখে'। এটাকে পাল্টে রাবী বলেছেন, 'হাঁটু রাখার পূর্বে যেন হাত রাখে'।

হযরত ইবনে উমর রা. এর হাদীসটিও সহীহ নয়। কেননা এতে আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ আদদারাওয়ার্দী রয়েছেন। তিনি উবায়দুল্লাহ আল উমারী থেকে এটি বর্ণনা করছেন। আব্দুল আযীযের কারণে দারাকুতনী এই হাদীসকে 'মা'লূল' বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। বায়হাকী র. বলেছেন,

كذا رواه عبد العزيز وما أراه إلا وهما يعني رفعه

অর্থাৎ আব্দুল আযীয এটা এভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি মনে করি এটা তার ভুল, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করাটা। ইমাম নাসায়ী র. বলেছেন,

حديثه عن عبيد الله العمري منكر اهـ

অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ আল উমারী থেকে তার বর্ণিত হাদীস মুনকার বা আপত্তিকর। (দ্র, আছারুস সুনান, পৃ ১৪৮)

আমলের পাল্লা কোনদিকে ভারী?

ইমাম তিরমিযী র. হযরত ওয়াইল রা. এর হাদীসটি উল্লেখপূর্বক বলেন,

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

অর্থাৎ এ হাদীস অনুসারে অধিকাংশ আলেমের আমল। তারা মনে করেন হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখবে। এবং হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠাবে। ইবনে হিব্বানও এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। তিনি হাদীসটির উপর এই অনুচ্ছেদ-শিরোনাম দিয়েছেন,

باب ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين

অর্থাৎ অনুচ্ছেদ-মুসল্লির জন্যে সেজদার সময় যমীনে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখা মুস্তাহাব হওয়ার আলোচনা সম্পর্কে। এমনিভাবে তার উস্তাদ ইবনে খুযায়মা র.ও এই হাদীস অনুসারে আমল করাকে সুন্নত বলেছেন। তিনি এই হাদীসকে রহিতকারী (ناسخ) এবং আগে হাত রাখার হাদীসকে রহিত (منسوخ) আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল মুনযির র. 'আলআওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন,

وقد تكلم في حديث ابن عمر ، قيل إن الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول (٣٢٧/٣)

অর্থাৎ হযরত ইবনে উমরের হাদীসটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সহীহ কথা হলো এটি হযরত ইবনে উমরের নিজস্ব আমল। আর হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীসটি প্রমাণিত। আমরাও এ অনুসারে আমল করে থাকি।

প্রথম রাকাত শেষ করে সোজা উঠে দাঁড়ানো সুন্নত

১. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. أخرجه الترمذي (٢٨٨) وقال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه.

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামনামাযে পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠে পড়তেন। তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৮; এর একজন রাবী খালিদ ইবনে ইলয়াস যঈফ। তিরমিযী র. বলেন, এ হাদীস অনুযায়ীই আলেমগণের আমল। তারা নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোই পছন্দ করতেন।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন,

....عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال(في المسيئ في الصلاة): إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. أخرجه البخاري (٦٦٦٧)

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা কর, তখন ভালভাবে ওযু করে নাও। অতঃপর কিবলামুখী হও। আল্লাহু আকবার বলো এবং কুরআনের যতটুকু তোমার জন্যে সহজ হয় পাঠ কর। অতঃপর রুকু কর এবং স্থির হয়ে রুকু কর। এরপর মাথা তোল এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এরপর সেজদা কর এবং সেজদায় স্থির হয়ে থাক। অতঃপর ওঠ এবং স্থির ও শান্ত হয়ে বসে পড়। এরপর আবার সেজদা কর এবং সেজদায় স্থির হয়ে থাক। অতঃপর উঠে সোজা

^ List

দাঁড়িয়ে যাও। পুরো নামাযে এভাবেই সব কাজ কর। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৬৬৭। এখানে দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে।

৩. ইকরিমা র. বলেন,

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري (٧٨٨)

অর্থ: আমি মক্কা শরীফে এক শায়খের পেছনে নামায পড়লাম। তিনি নামাযে ২২ বার আল্লাহু আকবার বললেন। আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে বললাম, লোকটি আহমক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, এটা তো আবুল কাসেম (রাসূল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৮৮।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, ১ম ও ৩য় রাকাতের পরে না বসেই উঠে পড়বে। অন্যথায় বসাই যদি সুন্নত হতো তাহলে তাকবীর ২৪ বার হওয়া উচিৎ ছিল। কেননা একথা স্বীকৃত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠানামায় তাকবীর বলতেন।

৪. হযরত আব্বাস বা আয়্যাশ ইবনে সাহল আস-সাঈদীর বর্ণনা:

أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ فذكر الحديث وفيه: ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ. أخرجه أبو داود (٩٦٦) وإسناده صحيح.

অর্থ: তিনি একটি মজলিসে ছিলেন যেখানে তার পিতাও ছিলেন। তার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন। উক্ত মজলিসে আবূ হুরায়রা রা., আবূ হুমায়দ আসসাঈদী রা. ও আবূ উসায়দ রা.ও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে একথাও আছে- পরে তিনি তাকবীর বললেন এবং সেজদা করলেন। এরপর আবার তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে গেলেন,বসেন নি। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৯৬৬। এর সনদ সহীহ।

৫. আব্দুর রহমান ইবনে গানম র. বলেন,

أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه و سلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار. أخرجه أحمد ٥/٣٤٣ (٢٣٢٩٤) قال النيموي: إسناده حسن

অর্থ: হযরত আবূ মালিক আল আশআরী রা . তার গোত্রের লোকদের একত্রিত করে বললেন, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের নারী ও সন্তানরা একত্রিত হও। আমি তোমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায শেখাব, যে নামায তিনি আমাদেরকে নিয়ে মদীনায় পড়েছিলেন। তারা সবাই একত্রিত হলে তিনি ওযু করলেন এবং সবাইকে তার ওযু দেখালেন। তিনি ওযুর স্থানগুলো ভাল করে ধৌত করলেন। অতঃপর যখন বেলা গড়ে গেল তখন তিনি দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। এরপর পুরুষদেরকে তার কাছের কাতারে দাঁড় করালেন। ছেলেদেরকে তার পরের কাতারে এবং নারীদেরকে তার পরের কাতারে দাঁড় করালেন। এরপর ইকামত দিয়ে সামনে গেলেন। অতঃপর হাত তুলে আল্লাহু আকবার বললেন। পরে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা নিঃশব্দে পাঠ করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকু করলেন। রুকুতে তিনবার বললেন, سبحان الله وبحمده এরপর বললেন, سمع الله لمن حمده এবং সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাকবীর বলে সেজদায় চলে গেলেন। পরে তাকবীর বলে মাথা

^ List

তুললেন। এরপর পুনরায় তাকবীর বলে সেজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রথম রাকাতে তার তাকবীর হলো ছয়টি। দ্বিতীয় রাকাত থেকে তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখনও তাকবীর বললেন। নামায শেষ করে গোত্রের লোকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, আমার তাকবীর (সংখ্যা) ভালভাবে স্মরণ রাখ এবং আমার রুকু ও সেজদা শিখে নাও। কেননা দিনের এই সময়ে আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়েছিলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই নামায।

(মুসনাদে আহমদ, ৫খ,৩৪৩পৃ, হাদীস নং ২৩২৯৪)। এর সনদ হাসান। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, আবুন নদর (أبو النضر) থেকে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনে বাহরাম আল ফাযারী থেকে, তিনি শাহর ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি ইবনে গানম থেকে।

এ হাদীসে তিনি প্রথম রাকাতের পর না বসে সোজা দাঁড়িয়ে গেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তেমনটি করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় জানা গেল যে, নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন নেই।

৬. নুমান ইবনে আবী আয়্যাশ র. বলেন,

أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو و لم يجلس .

أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠١١) وإسناده حسن ، قاله النيموي رحمه الله.

অর্থঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক সাহাবীকে দেখেছি, তারা ১ম ও ৩য় রাকাতে সেজদা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০১১। নীমাবী র. বলেছেন, এটির সনদ হাসান।

৭. আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ র. বলেন,

رمقت عبد الله بن مسعود رض في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال : ينهض على صدور قدميه في الركعة الاولى والثالثة. أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٦-٢٩٦٧) وابن

أبي شيبة (٣٣٩٩) والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٥/٢) وصححه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. (آثار السنن صـــ ١٥٢)

অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে নামাযে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম, আমি লক্ষ্য করলাম , তিনি সোজা উঠে পড়লেন, বসলেননা। তিনি আরো বলেন, তিনি ১ম ও ৩য় রাকাতে পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২৯৬৬,২৯৬৭। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৩৯৯,৪০০১। তাবারানী র. আলকাবীর গ্রন্থে, বায়হাকী আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে (২/১২৫), তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। হায়ছামী র. 'মাজমাউয যাওয়াইদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী। (দ্র, আছারুস সুনান,পৃ ১৫২)।

৮. আবু আতিয়্যা র. বর্ণনা করেছেন,

إن ابن عباس وابن عمر كانا يفعلان ذلك. أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٨)

অর্থ– হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে উমর রা.ও অনুরূপ করতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস নং ২৯৬৮।

৯. আব্দুর রায্যাক র. ইবনে জুরায়জ র. থেকে বর্ণনা করেন,

قال : أخبرني عطاء : أنه رأى معاوية إذا رفع رأسه من السجود لم يتلبث قال : ينهض وهو يكبر في نهضته للقيام. أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٠) وإسناده صحيح

অর্থ– আতা র. আমাকে বলেছেন,হযরত আমি মুআবিয়া রা.কে দেখেছি, তিনি সেজদা থেকে উঠে দেরী করতেন না। তাকবীর বলেই দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস নং ২৯৬০। এর সনদ সহীহ।

১০. ওয়াহব ইবনে কাইসান র. বলেন,

رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه .

أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٥) وإسناده صحيح.

অর্থ– আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা.কে দেখেছি, তিনি যখন দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠতেন তখন পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০৫। এর সনদ সহীহ।

১১. উবায়দ ইবনে আবিল-জা'দ র. বলেছেন,

كان على ينهض في الصلاة على صدور قدميه . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٠) وعن نافع كذلك (٤٠٠٧)

অর্থ– হযরত আলী রা. নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০০; নাফে' থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, (দ্র. হাদীস নং ৪০০৭) ।

১২. হযরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে খায়ছামা র. বলেন,

ينهض في الصلاة على صدور قدميه . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٢)

অর্থ– আমি তাঁকে নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে পড়তে দেখেছি। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০২।

১৩. শা'বী র. বর্ণনা করেন,

أن عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٤)

অর্থ– হযরত উমর রা. আলী রা. ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠে পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০৪।

১৪. ইমাম যুহরী র. বলেন,

كان أشياخنا لا يمايلون يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٩)

অর্থ– আমাদের উস্তাদগণ যখন ১ম ও ৩য় রাকাতে ২য় সেজদা থেকে উঠতেন তখন তাঁরা সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০৯।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের আমলের ভিত্তিতেই পরবর্তী যুগে প্রায় সকল আলেম একমত ছিলেন যে, ১ম ও ৩য় রাকাতের পরে না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

আল্লামা আলাউদ্দীন আল মারদীনী র. আল জাওরুন-নাকী গ্রন্থে লিখেছেন,

أجمعوا على أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض و لم يجلس إلا الشافعي.(١٢٦/٢)

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী র. ছাড়া সকল ইমাম ও আলেমই এ বিষয়ে একমত যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর সোজা দাঁড়িয়ে যাবে, বসবে না। (দ্র, ২খ, ১২৬পৃ)

মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বসার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ইমাম তাহাবী র. বলেন–

فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة وقال: ولو كانت هذه الجلسة مقصودة تشرع لها ذكر خصوص. (باختصار ٣٧٦/٢)

অর্থাৎ যখন দু'ধরণের বর্ণনার মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যাচ্ছে তখন মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলটি কোনো উযরের কারণে হয়ে থাকবে। এটা নামাযের সুন্নত হিসাবে করা হয়নি । তিনি আরো বলেন, এই বৈঠক যদি (উযর ছাড়া) হতো, তাহলে এতে বিশেষ কোন যিকিরের বিধান অবশ্যই রাখা হতো। (তাহাবী, ২খ. ৩৭৬পৃ.)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র.ও তাঁর যাদুল-মাআদ গ্রন্থে বলেছেন,

ولو كان هديُه صلى الله عليه وسلم فعلَها دائماً، لذكرها كلُّ من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجردُ فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدلُّ على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علِمَ أنه فعلها على أنها سنَّة يُقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة،

অর্থাৎ এটা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়মিত আমল হতো তবে তাঁর নামাযের বিবরণ দানকারী প্রত্যেক সাহাবী তা উল্লেখ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু কোন কাজ করাই একথা প্রমাণ করে না যে, এটা নামাযের একটি অনুসৃত আমল । তবে হ্যাঁ, যদি জানা যায় এটাকে তিনি অনুসরণযোগ্য সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন তবে সেটা নামাযের সুন্নত বলে গন্য হবে। কিন্তু যদি ধরে নেয়া হয় যে, তিনি বিশেষ প্রয়োজনে সেটা করেছেন, তাহলে তা নামাযের একটি সুন্নত বলে প্রমাণিত হবে না।(দ্র. ১খ. ২৪০ পৃ.)

এখন দেখলেন তো, লা-মাযহাবীরা আমাদেরকে কোন দিকে ডাকছে ?

^ List

নামাযে ১ম ও শেষ বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা ও ডান পা খাড়া রাখা সুন্নত

১: হযরত আয়েশা রা. বলেন,

كَانَ(رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-) يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. أخرجه مسلم في باب صفة الصلاة(٤٩٨) وابن أبي شيبة، (٢٩٤٣)

অর্থ: তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক দুই রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। এবং বাম পা বিছিয়ে দিতেন ও ডান পা খাড়া রাখতেন। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪৯৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৯৪৩।

২: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه سو لم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. أخرجه الترمذي(٢٩٢)وقال حسن صحيح وابن أبي شيبة، (٢٩٤٢).

অর্থ: আমি মদীনা শরীফে আসলাম, আর (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নামায দেখবো। (তিনি বলেন), যখন তিনি বৈঠক করলেন, অর্থাৎ তাশাহহুদের জন্যে তখন তার বাম পা বিছিয়ে দিলেন, এবং তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। আর ডান পা খাড়া রাখলেন। তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯২; তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহীহ। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৯৪২।

৩: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন,

إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى. أخرجه البخاري(٨٢٧) والنسائي(١١٥٧-١١٥٨) وابن أبي شيبة (٢٩٤٤).

অর্থ: নামাযে সুন্নত হলো ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৮২৭; নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ১১৫৭,১১৫৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৯৪৪।

নাসায়ী শরীফে বাম পায়ের উপর বসার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

এসব হাদীসে ১ম ও ২য় বৈঠকের মাঝে কোন পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। শুধু আবূ হুমায়দ সাঈদী রা. এর বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বৈঠকে উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে (বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে) নিতম্বের উপর বসে পড়তেন। এ হাদীসটির কারণে কোন কোন ফকীহ ও মুহাদ্দিস মনে করেন, উপরোক্ত হাদীসগুলো ১ম বৈঠক সম্পর্কে। কিন্তু হাদীসগুলোর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা তা সঠিক মনে হয়না। অনেকেই মনে করেন, আবূ হুমায়দ রা. এর হাদীসটিতে যে পদ্ধতিতে বসার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটাই বরং উযরের কারণে ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় বৈঠকে একইভাবে বসা হতো। যা উপরের হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় হযরত কা'ব রা., হযরত আলী রা., মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. ও ইবরাহীম নাখায়ী র. থেকেও এমনই বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা যেভাবে বৈঠক করেন, সে সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী র. লিখেছেন,

وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

অর্থাৎ কিছু কিছু আলেম এই মত অবলম্বন করেছেন। শাফেয়ী র. আহমাদ র. ও ইসহাক র. এরমতও এমনই।

আর হানাফীরা যেভাবে আমল করেন, সে সম্পর্কে তিরমিযী র. লিখেছেন,

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة

অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমের আমল হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস অনুসারে। সুফইয়ানছাওরী র., আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. ও কূফাবাসীদের মতও ছিল অনুরূপ।

লক্ষ্য করুন, পূর্বসূরি আলেমগণের অধিকাংশের আমল কি প্রমাণ করে না যে, হযরত আবূ হুমায়দ রা. বর্ণিত পদ্ধতিটি উযরের কারণে ছিল? অধিকন্তু এরা নিজেদেরকে সালাফী (পূর্বসূরিদের অনুসারী) বলে পরিচয় দেয়। অথচ তারা পূর্বসূরিগণের অধিকাংশের আমল ছেড়ে দিয়েছে! শুধু ছেড়ে দিয়েছে তাই নয়, বরং সেটিকে সুন্নতের পরিপন্থী আখ্যা দিচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সুফইয়ানছাওরী র. ও ইবনুল মুবারক র. প্রমুখ হাদীসের সাগর-মহাসাগররা বেঁচে থাকলে তাদেরকেও এরা সুন্নত শিখিয়ে দিত। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন।

বিত্র নামায পড়ার তরীকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও নির্দেশনা এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী খুলাফায়ে রাশেদীন ,অধিকাংশ সাহাবা-তাবেয়ীনের বর্ণনা ও আমল থেকে প্রমাণিত বিত্র নামায নিম্নরূপ:

ক.তিন রাকাত।

খ.দ্বিতীয় রাকাত শেষে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে যাবে। সালাম ফেরাবে তিন রাকাত পূর্ণ করে।

গ. বিত্র নামায মাগরিবের নামাযেরই অনুরূপ। অর্থাৎ দুই বৈঠক ও এক সালামে তিন রাকাত। তবে পার্থক্য হল বিত্র নামাযের তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা মেলাবে, যা মাগরিবের নামাযে নেই।

ঘ.তৃতীয় রাকাতে সূরা মিলানোর পর তাকবীর বলে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে।

নিম্নে হাদীস ও আছার থেকে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করা হল:

ক.বিত্র নামায তিন রাকাত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিত্র পড়তেন–

১.হযরত আবু সালামা র. থেকে বর্ণিত–

أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا . قالت عائشة فقلت يارسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي رواه البخارى برقم ١١٤٧ ومسلم برقم ٧٣٤ ومحمد فى الحجة على اهل المدينة ١/١٣٣ وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا فى الاستذكار٢/١٠٠ في معنى قوله في حديث هذا الباب: أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا وجه رابع وهو أنه كان ينام بعد الأربع ثم ينام بعد الأربع ثم يقوم فيوتر بثلاث.

অর্থ: তিনি হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করেন যে,রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন হত? তিনি উত্তরে বলেন–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে এবং রমযানের বাইরে এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করোনা! এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে প্রশ্ন করোনা! এরপর তিন রাকাত (বিত্র) পড়তেন। সহীহ বুখারী হা.১১৪৭ সহীহ মুসলিম হা.৭৩৪

২.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস বলেন–

قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر ؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة.رواه ابوداود فى السنن برقم- ١٣٥٧ واحمد فى المسند برقم ٢٥١٥٩ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠١/١ وقال العينى فى نخب الافكار ٢٤١/٣ اسناده صحيح.

অর্থ: আমি হযরত আয়েশা রা. এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে,নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্রে কত রাকাত পড়তেন? উত্তরে বলেন– চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন এবং দশ ও তিন। তিনি বিত্রে সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক পড়তেন না। সুনানে আবু দাউদ ১/১৯৩ হা.১৩৫৭ তহাবী শরীফ ১/২০১ মুসনাদে আহমদ ৬/১৪৯ হা.২৫১৫৯

এ হাদীসে রাতের পুরো নামাযকেই বিত্র শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর সর্বাবস্থায় তিন রাকাত আলাদা ভাবে পড়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে, এটিই বিত্র।

৩.হযরত সা'দ ইবনে হিশাম র.বর্ণনা করেন–

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن.ثم صلى ركعتين وهو جالس يركع وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس. رواه احمد فى المسند برقم ٢٥١٠١ ورجاله ثقات رجال الشيخين ما خلا محمد راشد وهم ثقة، كذا قال شعيب الارنووط فى تحقيق المسند.

অর্থ: হযরত আয়েশা রা.বলেন– ইশার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর আরও দুই রাকাত পড়তেন, যা পূর্ব থেকে দীর্ঘ হত। তার পর তিন

^ List

রাকাতে বিত্র পড়তেন, তাতে মাঝে অর্থাৎ দুই রাকাত শেষে সালাম ফেরাতেন না। মুসনাদে আহমদ-৬/১৫০-১৫১ হা.২৫১০১

স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্র নামায পড়তেন শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর। তাই তাঁর বিত্র নামায সম্পর্কে সবচে' বেশী অবগত ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.। তাবেয়ী হযরত সা'দ ইবনে হিশাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে নবীজীর বিত্র নামাযের তরীকা জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাঁকে পাঠালেন হযরত আয়েশা রা. এর কাছে, আর বললেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্র নামায সম্পর্কে দুনিয়ার সবচে' বেশী জানেন হযরত আয়েশা রা.।

সহীহ মুসলিম হা.১৭৩৯

হযরত আয়েশা রা. থেকে নবীজীর বিত্র নামায সংক্রান্ত এ হাদীস বর্ণনা করেছেন–উরওয়া, মাসরূক, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, আসওয়াদ, আবুসালামা, সা'দ ইবনে হিশাম, আলকামা, আবদুল্লাহ ইবনে আবী কাইস, আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক প্রমুখ। এসকল হাদীস বহু সনদে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সকল বর্ণনাগুলো সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উপরে বর্ণিত তরীকায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্র পড়েছেন। এমর্মে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. উপরোল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীসটি সম্পর্কে লেখেন–

وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم.فتح البارى-٣-٢٦

আমার জানামতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ রেওয়ায়াত। এবিষয়ে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এর দ্বারা সে সবের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

ফাতহুল বারী ৩/২৬

হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন–

ولكن اذاكشفت معانيها يرجع كلها الى معنى واحد.وهو المعنى الذى يفهم من حديث سعد ابن هشام من ان الوتر ثلاث ركعات بقعدتين وتسليمة واحدة فى آخره. نخب الافكار ٣/٢١٦

^ List

অর্থাৎ বর্ণিত হাদীসের বিভিন্নতার মাঝে সমন্বয় করলে অর্থ দাঁড়ায়, বিত্র নামায দুই বৈঠক ও এক সালামে তিন রাকাত,যা সা'দ ইবনে হিশামের হাদীস থেকে বুঝে আসে। নুখাবুল আফকার ৩/২১৬

৪.হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. رواه النسائى فى السنن ٢٤٩/١ برقم ١٧٠٧ والطحاوى ٢٠٢/١ وقال العينى فى نخب الافكار ٢٥٢/٣ على شرط مسلم.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে আট রাকাত নামায পড়তেন। অতপর তিন রাকাত বিত্র পড়তেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯ হা.১৭০৭ তহাবী ১/২০২ নুখাবুল আফকার ৩/২৫১

৫.হযরত শাবী র. বলেন–

سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل . فقالا ثلاث عشرة ركعة ، منها ثمان، ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر.رواه ابن ماجة فى السنن برقم ١٣٦١ وابن نصر فى صلاة الوتر كما فى مختصرالمقريزى– ٢٦٠ والطحاوى فى شرح معانى الآثار١٩٧/١:وقال العينى فى نخب الافكار ٢١١/٣ :اسناد صحيح على شرط الشيخين.

অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞেস করেছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কেমন ছিল? তাঁরা উভয়ে বলেন: (তিনি রাতে) মোট তের রাকাত (নামায) পড়তেন। প্রথমে আট রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিন রাকাত বিত্র পড়তেন। আর ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নত) আদায় করতেন। সুনানে ইবনে মাযাহ হা.১৩৬১ তহাবী ১/১৯৭ এর সনদ সহীহ, নুখাবুল আফকার ৩/২১১ সালাতুল বিত্র পৃ.২৬০

৬.মুহাম্মদ ইবনে আলী তাঁর পিতা থেকে, এবং তিনি তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন–

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .رواه النسائى فى السنن برقم- ١٧٠٤ واحمد فى المسند برقم-٣٢٧١ وقال شعيب : إسناده قوي على شرط مسلم. والطحاوى فى شرح معانى الاثار ١/٢٠١-٢٠٢

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয্যা থেকে উঠলেন। এরপর মিসওয়াক করলেন, অযু করলেন এবং দুই রাকাত নামায পড়লেন; এভাবে দুই-দুই করে ছয় রাকাত পূর্ণ করলেন। এরপর তিন রাকাত বিত্‌র পড়লেন। এবং সবশেষে আরও দুই রাকাত নামায পড়লেন। সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯ হা.১৭০৪ মুসনাদে আহমদ ১/৩৫০ হা.৩২৭১ তহাবী শরীফ ১/২০১-২০২

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায়–

ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث.

অর্থাৎ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তিন বারে ছয় রাকাত নামায আদায় করলেন। প্রতি বারই মিসওয়াক ও অযু করেছেন এবং উপরিউক্ত আয়াতগুলো পড়েছেন। সবশেষে তিন রাকাত বিত্‌র পড়েছেন। সহীহ মুসলিম ১/২৬১ হা.৭৬৩ সহীহ আবু আওয়ানা ২/৩২১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিত্‌র নামাযের আরেক প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। তিনি একবার নবীজীর ঘরে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁর নামায প্রত্যক্ষ করার জন্য। তাঁর কাছ থেকে ঐ রাতের বিবরণ সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন–হযরত কুরাইব, তাউস, আবু যামরাহ, সায়ীদ ইবরে যুবাইর, শা'বী, আবু মিজ্‌লায, আবু রিশ্‌দীন, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইক্‌রিমা ইবনে খালেদ, আতা, ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ, ইয়াহ্‌ইয়া আল জায্‌যার, হাবীব প্রমুখ। এতে তিনি কখনো সংক্ষেপে কখনো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন; বর্ণনাকারীগণও এমনটি করেছেন। ফলে একরতের ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এর বিবরণ বিভিন্নভাবে এসেছে। এসকল বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে,উপরোল্লেখিত তরীকায়ই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামায আদায় করেছেন। উপরন্তু সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আব্বাস রা. কে বিত্‌র নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলে তিনি তাকে হযরত আয়েশা রা. এর কাছে পাঠান। আর বলে দেন– তিনি কি বলেছেন আমাকেও জানাবে। অতঃপর সা'দ ইবনে হিশাম ফিরে এসে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলেন। সব শুনে ইবনে আব্বাস রা. বললেন– ঠিক বলেছ, এটিই বিত্‌র নামাযের পদ্ধতি। সুযোগ থাকলে আমি সরাসরি হযরত আয়েশা রা. এর কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে আসতাম। সহীহ মুসলিম হা.১৭৩৯

সুতরাং বোধগম্য হয় যে, রাসুলের বিত্‌র নামাযের বিবরণে তাঁরা উভয়ে একমত–অর্থাৎ বিত্‌র নামায তিন রাকাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন এবং তিন রাকাতে তিনটি নির্দিষ্ট সূরা তিলাওয়াত করতেন:

১. আব্দুল আযীয ইবনে জুরাইজ বলেন–

سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين. رواه الترمذى فى السنن١/٦١ برقم–٤٦٣ وقال :هذا حديث حسن صحيح.(احمد شاكر) وابوداود ١/٢٠١ وابن ماجة صـــ ٧٣ واحمد فى المسندبرقم–٢٥٩٤٨ والخوارزمى فى جامع المسانيد١/٤٠٧–٤٠٨ . وقال الحافظ ابن حجر فى نتائج الافكار فى تخريج الاذكار١/٣٥٥:هذا حديث حسن.

অর্থ: আমি আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাযে কী কী সূরা পাঠ করতেন? উম্মুল মু'মিনীন বলেছেন, তিনি প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ ও 'মুআওয়াযাতাইন' (ফালাক ও নাস) পড়তেন। সুনানে তিরমিযী ১/৬১ সুনানে আবু দাউদ ১/২০১ সুনানে ইবনে মাযাহ পৃ.৭৩ মুসনাদে আহমদ ৬/২২৭ জামেউল মাসানীদ ১/৪০৭-৪০৮

২. হযরত 'আমরা বিনতে আব্দুর রহমান উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন–

^ List

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث. يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. رواه الحاكم فى المستدرك ٣٠٥/١ برقم-١١٤٤ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. وقال الذهبي فى التلخيص: رواه الثقات عنه، وهو على شرط البخارى ومسلم. ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠١/١.وقال الذهبى فى تنقيح التحقيق ٣٢٨/١- تصحيحا للحديث وردا على ابن الجوزى :هذا تعنت فان يحى بن ايوب من رجال الصحيحين. وقال الحافظ ابن حجر فى نتائج الافكار فى تخريج احاديث الأذكار٣٥٦/١: هذا حديث حسن. وقال فى التلخيص١١٠/٢: قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : إِسْنَادُهُ صَالِحٌ . وقال العينى فى نخب الافكار :اسناده صحيح.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামায তিন রাকাত পড়তেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়তেন। আলমুসতাদরাক ১/৩০৫ তহাবী ১/২০১ হাদীসটি সহীহ- আত্‌তানকীহ লিয যাহাবী ১/৩২৮ নাতাইযুল আফকার ফি তাখরীজিল আযকার লি ইবনে হাজার ১/৩৫৬

৩.হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـــ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِبِـــ قُلْ يَا أَيُّهَاالْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـــ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

رواه النسائى فى السنن١٩١/١ برقم-١٦٩٩والطحاوى فى شرح مشكل الآثار ٣٦٨/١١ وقال شعيب:اسناده صحيح. وابن ماجة برقم-١١٨٢ وابوعلى ابن السكن فى الصحح كما ذكره الحافظ فى التلخيص ١٨/٢ وقال ابن القطان فى الوهم والايهام : صححه ابومحمد عبدالحق ووافقه فيه ابن القطان أيضا. وقال العينى فى العمدة ١٩/٧:اسناده صحيح.وقال الألبانى فى ارواء الغليل ١٦٧/٢: قلت : وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن ميمون وهو ثقة كما في " التقريب ". وقد تابعه فطر بن خليفة عند الدارقطني (١٧٥) ومسعر بن كدام عند البيهقي (٢ / ٤٠) كلاهما عن زبيد به . قلتِ : فصح بذلك الإسناد . وله إسناد آخر عن سعيد بن عبد الرحمن الخ

^ List

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। এবং রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন । সুনানে নাসায়ী ১/১৯১ হা.১৬৯৯ মুশকিলুল আছার ১১/৩৬৮ হাদীসটি সহীহ, আলওয়াহামু ওয়াল ইহাম ৩/৩৮৩ আলবানী সাহেবও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন– ইরওয়াউল গালীল ২/১৬৭

৪.সায়ীদ ইবনে জুবাইর রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.থেকে বর্ণনা করেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد.رواه النسائى فى السنن ٢٤٩/١ برقم-١٤٢٧ والترمذى ٦١/١ برقم-٤٦٢ والدارمى برقم-١٥٨٩ وابن ابى شيبة ٥٥٢/٤ برقم-٦٩٥١ واحمد فى المسند ٢٩٩/١ .قال الشيخ محمود سعيد ممدوح فى "التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف" ٤٣٩/٤ :اسناده صحيح كما قال الامام النووى وغيره. وقال ايضا ٤٤٤/٤ :صحيح الاسناد رجاله حفاظ ثقات.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামায তিন রাকাত পড়তেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। সুনানে নাসায়ী১/২৪৯ হা.১৪২৭ সুনানে তিরমিযী ১/৬১ হা.৪৬২ সুনানে দারিমী হা.১৫৮৯ ইবনে আবি শাইবা ৪/৫১২ হা.৬৯৫১ মুসনাদে আহমদ১/২৯৯-৩০০

ইমাম নববী ও অন্যান্যরা বলেছেন– এ হাদীস সহীহ– আত্তা'রীফ, মাহমূদ সায়ীদ মামদূহ-৪/৪৪৪

৫.হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্‌যা রা.বর্ণনা করেন–

أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الوتر فقرأ في الأولى بـــ سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بالثالثة.رواه النسائى فى السنن برقم- ١٧٣٣.والطحاوى فى شرح معانى الآثار٢٠٥/١ وابن ابى شيبة برقم- ٦٩٤٣ والخوارزمى فى جامع المسانيد ٤١٤/١ واحمد برقم-١٥٣٩٠ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ في

^ List

التلخيص ٢/١١١ : وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

.وقال العينى فى نخب الافكار ٣/٢٧١ :رجاله ثقات. وقال الشيخ محمد عوامة :اسناد

المصنف (ابن ابى شيبة) صحيح.

অর্থাৎ তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সাথে বিত্‌র পড়েছেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়েছেন। তহাবী ১/২০৫ ইবনে আবীশাইবা ৪/৫১০ হা.৬৯৪৪ কিতাবুল আছার-১/৩২৬ জামেউল মাসানীদ ১/৪১৪

ইবনে হাজার আসকালানী র. আত্তালখীছুল হাবীরে বলেন اسناده حسن এই সনদ হাসান তথা নির্ভরযোগ্য।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর সাহাবা-তাবেয়ীগণও তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন। নিম্নে কিছু আছার তুলে ধরা হল–

১.হযরত উমর রা. বলেন–

ما احب انى تركت الوتر بِثَلاَثٍ وان لى حمر النعم. رواه ابو حنيفة فى كتاب الآثار ومحمد فى الموطأ صـــ ١٤٩ـ وفى كتاب الحجة على اهل المدينة ١/١٣٥.وذكره الخوارزمى فى جامع المسانيد ١/٤١٧.

অর্থ: আমি তিন রাকাতে বিত্‌র পড়া ছাড়তে কখনোই পছন্দ করি না, যদিও এর বিপরীতে আমাকে লাল উট উপহার দেওয়া হয়। কিতাবুল আছার –জামেউল মাসানীদ ১/৪১৭ মুয়াত্তা মুহাম্মদ পৃ.১৪৯

২.হযরত যাযান র. বলেন–

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ.رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم– ٦٩١٤ وعبد الرزاق فى المصنف ٣/٣٤

অর্থ: হযরত আলী রা. তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৯১৪

৩.হযরত আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর র. বলেন–

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ.رواه ابن ابى شيبة برقم- ٦٨٩٤ والطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد ٥٠٣/٢

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯৪

৪.হযরত ছাইব ইবনে ইয়াযীদ র. বলেন–

أن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث.رواه عبد الرزاق برقم-٤٦٦١

অর্থ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। মুসাননাফে আব্দুররাযযাক ৩/২৬ হা.৪৬৬১

৫.হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন–

لما أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أن يقوم بالناس في رمضان ، كان يوتر هم فيقرأ في الركعة الأولى : إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة : قل هو الله أحد .رواه ابن نصر المروزى فى صلاة الوتر ص. ٢٧٩

অর্থ: হযরত উমর রা. যখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. কে রমযানে (তারাবীহ ও বিত্‌র এর) ইমামতির আদেশ করলেন, তখন তিনি বিত্‌র নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা কাদর, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ। সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী–পৃ.২৭৯

৬.হযরত হুমাইদ র. বলেন–

عن أنس رضي الله عنه قال الوتر ثلاث ركعات وكان يوتر بثلاث ركعات.رواه ابن ابى شيبة برقم-٦٨٩٣ والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠٢/١ وابن نصر فى صلاة الوتر صـــ ٢٧٠ وقال الحافظ فى الدراية : اسناده صحيح.وقال العينى فى نخب الافكار ٢٨١/٣ اخرجه من طريقين صحيحين.

অর্থ: হযরত আনাস রা. বলেছেন–বিত্‌র নামায তিন রাকাত। এবং তিনি নিজেও তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯৩ তহাবী ১/২০২ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী–পৃ.২৬৪

এর সনদ সহীহ– আদদিরায়াহ, নুখাবুল আফকার ৩/২৮১

৭.হযরত আবু গালিব র. বলেন–

كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ. رواه ابن ابى شيبة برقم– ٦٨٩٦ والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠٢/١

অর্থ: হযরত আবু উমামা রা.তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। ইবনে আবী শাইবা ৪/ ৪৯১হা.৬৮৯৬

৮.হযরত আবু মানসূর বলেন–

قال : سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال ثلاث. رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠٣/١

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করেছি–বিত্‌র কত রাকাত ? তিনি বললেন–তিন রাকাত। তহাবী ১/২০৩

অনুরূপ তাবেয়ীদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে যুবাইর,আলকামা,ইবরাহীম নাখায়ী, জাবের ইবনে যায়েদ,হাসান, ইবনে সীরীন , কাতাদাহ , বাক্‌র ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুযানী,মুয়াবিয়া ইবনে কুররা ,ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া প্রমুখ থেকেও তিন রাকাত বিত্‌র পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি হযরত সুফ্‌ইয়ান ছাউরী র. তাঁর অনুসরণীয় পূর্বসূরি মহা মনীষীদের তিন রাকাত বিত্‌র পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন– তারা তিন রাকাত বিত্‌রে তিনটি সুনির্দিষ্ট সূরা অর্থাৎ সূরা আ'লা,কাফিরুন ও ইখলাছ পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন। দ্রষ্টব্য- বিত্‌র অধ্যায়ের (গ) অংশের ১১ নং আছার।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট যে, সাহাবা-তাবেয়ীগণও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাত বিত্‌র পড়েছেন এমন একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যাবে না। হযরত আয়েশা রা. স্পষ্ট বলেছেন–

و لم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة .

তিনি বিত্‌রে সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক পড়তেন না। (সুনানে আবু দাউদ হা.১৩৫৭)

উল্লেখ্য যে, এ সাত রাকাতের তিন রাকাত হল বিত্‌র যা হযরত আয়েশা রা. আলোচ্য হাদীসের প্রথমাংসে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

(দ্রষ্টব্য বিত্‌র অধ্যায়ের (ক) অংশের দ্বিতীয় হাদীস।)

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন এবং দুই রাকাত পূর্ণ করে নামাযের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রথম বৈঠক করতেন; কিন্তু সালাম ফিরাতেন তিন রাকাত পূর্ণ করে:

১.হযরত সা'দ ইবনে হিশাম বলেন-

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن . و هذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه و عنه أخذه أهل المدينة .رواه الحاكم فى المستدرك ٣٠٤/١ والنسائى فى السنن ٢٢٨/١ وابن ابى شيبة برقم-٦٩١٣ ومحمد فى كتاب الحجة فى اهل المدينة ١٣٧/١ والطحاوى فى شرح معانى الآثار ١٩٣/١ وقال العينى فى نخب الافكار ٢١٤/٣:صحيح على شرط الشيخين. وقال محمود سعيد فى التعريف ٤٤٠/٤:الحديث صحيح حجة لا تفرد فيه ولا شذوذ .وقال النووي في " المجموع "٤ / ١٧ :حديث عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان لا يسلم في ركعتي الوتر . رواه النسائي بإسناد حسن ورواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد صحيح.وقال الكشميرى :سند الحديث فى غاية القوة.

وقال الذهبي فى التنقيح٣٢٦/١: بعد هذاالحديث- قلنا يجوز هذا ان يوتر بثلاث بسلام واحد ، لكن يتشهد بيهم كاالمغرب. وكذا قال ابن حزم الظاهرى فى "المحلى" ٨٩/٢.

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন এবং শুধু শেষ রাকাতে সালাম ফেরাতেন।

হাকেম এই বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন–আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রা.ও বিত্‌র এভাবে পড়তেন এবং তার কাছ থেকেই মদীনাবাসী এ আমল গ্রহণ করেছে।

আলমুসতাদরাক ১/৩০৪ হা.১১৮১ নাসায়ী ১/২২৮ হা.১৬৯৮ ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩-৪৯৪ হা.৬৯১৩ কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা ১/১৩৭ হাদীস সহীহ–নুখাবুল আফকার ৩/২১৪ ও আত্তা'রীফ ৪/৪৪০

উল্লেখ্য যে, হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম যাহাবী র. বলেন– এ হাদীস থেকে বুঝা যায় নবীজীর বিত্‌র নামায ছিল তিন রাকাত এক সালামে। তবে তাতে মাগরীবের নামাযের মত মাঝে বৈঠক করতেন। আততানকীহ ১/৩২৬ ইবনে হাযাম জাহেরী র. ও এ হাদীসের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আল-মুহাল্লা ২/৮৯

২.হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন–

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف . أول ركعة بـــ " سبح اسم ربك الأعلى " والثانية بـــ " قل يا أيها الكافرون " والثالثة بـــ " قل هو الله أحد " وأنه قنت قبل الركوع فلما انصرف من صلاته قال سبحان الملك القدوس مرتين يرفع صوته ويجهر بالثالثة.رواه الطحاوى فى مشكل الآثار ١١/٣٦٨ قال شعيب : اسناده صحيح. والنسائى فى السنن برقم ١٧٠١ وقد سبق تخريجه.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন। শেষ রাকাতেই কেবল সালাম ফেরাতেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা পড়তেন। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা ইখলাছ পড়তেন। তিনি (তৃতীয় রাকাতে) রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনূত পড়েছেন। নামায শেষে দুই বার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস সামান্য আওয়াজে পড়েছেন; তৃতীয় বারে সজোরে পড়েছেন। শরহু মুশকিলিল আছার ১১/৩৬৮ .হা.৪৫০১ সহীহ–শুয়াইব আরনাউত। সুনানে নাসায়ী হা.১৭০১

৩.হযরত ছাবেত আল বুনানী র. বলেন–

قال ثم صلى بي العشاء ثم صلى ست ركعات يسلم بين الركعتين ثم أوتر بثلاث يسلم في آخرهن.رواه ابن عساكر فى "التاريخ"٣٦٣/٩ فى ترجمة انس بن مالك رض. وروى الترمذى نفس هذا الحديث مقتصرا على بعض متنه بهذاالاسناد فى مناقب انس برقم-٣٨٣١ وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب . قال الكشميرى :سنده قوى.كما فى معارف السنن ٢٠٩/٤.

অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. আমাকে বলেছেন, হে আবু মুহাম্মাদ! (ছাবেত এর উপনাম) আমার কাছ থেকে শিখে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি। আর তিনি আল্লাহ তাআলা থেকে গ্রহণ করেছেন। তুমি শেখার জন্য আমার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য অন্য কাউকে পাবে না। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামায পড়লেন। এর পর ছয় রাকাত নামায পড়লেন এবং এর প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরান। তারপর তিন রাকাতে বিত্র পড়লেন এবং সবশেষে সালাম ফেরান। তারীখে ইবনে আসাকির ৯/৩৬৩ আনাস ইবনে মালেক অধ্যায়। সুনানে তিরমিযী হা.৩৮৩১ (আংশিক) এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী, মা'আরিফুস সুনান ৪/২০৯

৪.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

أرسلت أمي ليلة لتبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر كيف يوتر فباتت عند النبي فصلى ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ: بسبح اسم ربك الأعلى " في الركعة الأولى وقرأ في الثانية: " قل يا أيها الكافرون " ثم قعد، ثم قام و لم يفصل بينهما بالسلام ثم قرأ بـــــ " قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد " حتى إذا فرغ كبر ثم قنت فدعا بما شاء الله أن يدعو ثم كبر وركع . ذكره بهذا اللفظ ابن عبد البر فى الاستيعاب١٩٤٦/٤ وذكره الحافظ ابن حجر فى الاصابة ٢٥٦/٧ وقال . رواه ابن ابى شيبة فى المصنف باختصار٥٢١/٤ وكذا فى مسنده كما فى

المطالب العالية ٣٧/٣ و الدارقطنى فى السنن ٣٢/٢ والبيهقى الكبرى ٤١/٣ والحافظ طلحة بن محمد فى مسند ابى حنيفة كما فى جامع المسانيد ٣١٨/١ ،وقال فى جامع المسانيد: قال الحافظ (لعله الخوارزمى) اسناده حسن. وفى كلها روى يزيد ابن هارون و الامام ابو حنيفة والامام سفيان الثورى و حفص بن سليمانل هؤلاء الايمة عن ابان ابن ابى عياش به.

وابان مختلف فيه–فقال الطحاوى فى مشكل الاثار١١–٣٦٥: وإن كان إنما دار على أبان بن أبي عياش فإنه قد احتمله غير واحد من أهل الأسانيد ، وأدخلوه في هذا الباب إذا كان عن غير أنس بن مالك ، فأدخلناه نحن أيضا فيه لذلك . وقال ابن عدى فى الكامل١/٣٨١:ارجو انه ممن لايتعمد الكذب ،الا انه يشبه اليه ويغلط . وعامة ما اتى به ابان من جهة الرواة لا من جهته.لانه روى عنه قوم مجهولون انتهى. وتكلم شعبةُ على ابان ،ثم هو لم يصبر على أن روى عنه حديث القنوت هذا.وذكر ابن عدى ان يزيد بن هارون قال لشعبة —اتقول فى ابان ما قلت وتحدث عنه؟!

و مع ذلك تابعه الامامُ الاعمش عند البيهقى فى الخلافيات كما فى الجوهر النقى ٤٢/٣(مع السنن) وتابعه ايضا يزيد بن هارون كما ذكره الحافظ فى الاصابة ٢٥٦/٨ سكت عليه بل صنيعه فيه – يدل على ان لهذا الاسناد مكانا عنده .

অর্থাৎ আমার মাকে পাঠালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (স্ত্রীদের) নিকট রাত্রি যাপন করে তাঁর বিত্‌র নামায প্রত্যক্ষ করার জন্য। তিনি একদিন থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে নামায পড়লেন, যতটুকু আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে। অতঃপর শেষ রাতে যখন বিত্‌র পড়তে দাঁড়ালেন, প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন পড়লেন। এরপর প্রথম বৈঠক করলেন এবং সালামের মাধ্যমে নামায পৃথক না

করেই তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে সূরা ইখলাছ পড়ে শেষে তাকবীর বলে দূয়ায়ে কুনূত পড়লেন। তার পর তাকবির দিয়ে রুকুতে গেলেন। আল ইসতিআব ৪/১৯৪৬ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫২১ সুনানে দারা কুতনী ২/৩২ সুনানে বাইহাকী ৩/৪১

হাদীসটি হাসান তথা আমল যোগ্য– জামেউল মাসানীদ ১/৩১৮

৬.হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يشْخِص رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ... رواه مسلم ف الصحيح برقم–١١٣٨

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতেন তাকবীর দিয়ে এবং কেরাত শুরু করতেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দিয়ে। রুকুতে মাথা উপরেও উঠাতেন না আবার নিচেও নামাতেন না। বরং মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন। রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাড়িয়ে সেজদায় যেতেন না। এক সেজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে না বসে আরেক সেজদায় যেতেন না। আর তিনি বলতেন– নামাযের প্রতি দুই রাকাতেই একবার করে বৈঠক করবে। .... সহীহ মুসলিম হা.১১৩৮

লক্ষ করুন! হযরত আয়েশা রা. এ হাদীসে সকল নামাযের বিবরণ দিয়েছেন। এবং এতে বলেছেন–**'তিনি বলতেন– নামাযের প্রতি দু' রাকাতেই একবার করে বৈঠক করবে'**। যদি বিত্‌র নামাযের প্রথম রাকাতে বৈঠক না থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই একথা উল্লেখ করতেন। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ভাষা অনুসারে হযরত আয়েশা রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিত্‌র নামায সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন। সহীহ মুসলিম–১৭৩৯

সাহাবা-তাবেয়ীনও একই নিয়মে বিত্‌র পড়তেন। এখানে কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরা হল–

১.হযরত মাকহুল র. বলেন–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ. رواه ابن ابی شيبة فی المصنف برقم- ٦٩٠١

অর্থ: হযরত উমর রা. তিন রাকাতে বিত্র পড়লেন। এবং দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফেরাননি। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯২ হা.৬৯০১

২.হযরত মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা রা. বলেন–

دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر انى لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن. رواه ابن ابی شيبة فی المصنف برقم-٦٨٩١ والطحاوى ٢٠٦/١ وعبد الرزاق ٢٠/٣ وابن نصر المروزى فی صلاة الوتر صـــ ٢٧٠

অর্থ: আমরা রাতের বেলা হযরত আবু বকর রা. এর দাফন সম্পন্ন করলাম। তখন হযরত উমর রা. বলেন–আমি বিত্র পড়িনি। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন । আমরাও তাঁর পিছনে কাতার বাঁধলাম। তিনি তিন রাকাত নামায পড়লেন এবং সবশেষে সালাম ফিরালেন। তহাবী ১/২০৬ ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯১ মুসান্নাফে আব্দুররায্যাক ৩/২০ সালাতুল বিত্র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭০

৩.হযরত হাবীব আল মুআল্লিম বলেন–

قيل للحسن أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال : كان عمر أفقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير.رواه الحاكم فی المستدرك برقم- ١١٤١ والبيهقى فی الكبرى برقم-٥٠٠٣. وابن نصر فی صلاة الوتر صـــ ٢٧٠. رجاله ثقات ما خلا شيخ الحاكم -احمد بن محمد السمرقندى ، وهو ثقة. لانه قد روى عنه الحاكم فی مواضع من صحيحه وصحح له برقم-١١٣٧ ووافقه فيه الذهبى فی التلخيص.ووصفه الحاكم -بـــ"الحافظ" فی اسناد عند البيهقى فی شعب الايمان برقم-١٠٠٣٧. فهو ايضا ثقة. وذكره الحافظ فی فتح البارى ٥٥٨/٢ وسكت عليه، بل رضيه وبين معناه.

অর্থ: হাসান বসরী রা. কে জিজ্ঞেস করা হল– আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বিত্‌রের দুই রাকতের পর সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাত পৃথক পড়েন? তিনি বলেন– খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. তাঁর থেকে বেশী প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তিনি (দ্বিতীয় রাকাতে স্বাভাবিক নিয়মে বৈঠক শেষে সালাম না ফিরিয়ে) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। আলমুসতাদরাক হা.১১৪১ সুনানে কুবরা–বাইহাকী হা.৫০০৩ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭০ । এ হাদীসের সনদ সহীহ । হাফেজ ইবনে হাজার র. মৌনভাবে এর সমর্থন করেছেন। ফাতহুল বারী ২/৫৫৮

লক্ষণীয়,এ বর্ণনায় বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী র. বিত্‌রের দুই রাকাতে সালাম ফেরানোর মতকে দৃঢ়তার সাথে খন্ডন করেছেন এই অজুহাতে যে, এ বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা কি ছিল এ ক্ষেত্রে হযরত উমর রা. ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে দুই ধরণের বিবরণ পাওয়া যায়। সুতারাং এখানে ইবনে উমরের তুলনায় তাঁর পিতা উমর রা.ই অধিক অনুসরণযোগ্য। কারণ তিনি ছিলেন অধিক প্রাজ্ঞ। হযরত উমরের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থা এত বেশী ছিল যে, তিনি বলেন– আমার পর যদি কেউ নবী হত, তাহলে সে হত উমর। আলমুসতাদরাক, হা.৪৪৩৩ তিরমিযী হা.৩৬৪৮

৪.হযরত ছাবেত র. বলেন–

صلى بي أنس رضي الله عنه الوتر– أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا – ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن ، ظننت أنه يريد أن يعلمني. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم–٦٩١٠ والطحاوى ٢٠٦/١

অর্থ: হযরত আনাস রা. আমাকে নিয়ে বিত্‌র পড়লেন। আমি তাঁর ডান পাশে দাঁড়ালাম এবং তাঁর (বাদী) উম্মে ওয়ালাদ আমাদের পিছনে দাঁড়াল। তিনি তিন রাকাত নামায পড়লেন এবং তিন রাকাত পূর্ণ করেই সালাম ফিরালেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমাকে (বিত্‌র নামাযের তরীকা) শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি করেছেন। তহাবী ১/২০৬ ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯১০

৫.হযরত হসান বসরী র. বলেন–

كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب.رواه عبد الرزاق برقم- ٤٦٥٩ وابن نصرصـــ ٢٧٠. رجاله ثقات.

অর্থ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. মাগরিবের নামাযের মতই তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। এবং সালাম ফিরাতেন তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে।

মুসান্নাফে আব্দুররায্‌যাক ৩/২৬ হা.৪৬৩৯ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ.১২২ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

৬.হযরত আবু ইসহাক বলেন–

كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لاَ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم-٦٩١١ وابن نصر صـــ ٢٧٠.اسناده صحيح.

অর্থ: হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ বিত্‌রের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯১১ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭১

৭.হযরত হিশাম র. বলেন–

عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ ، لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم-٦٩٠٦

অর্থ: হযরত মাকহুল র. তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। সালাম ফিরাতেন তিন রাকাত পূর্ণ করেই। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৬

৬.হযরত হাম্মাদ র. বলেন–

نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم-٦٩٠٨ . واسناده صحيح.

ফকীহ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী র. বিত্‌রের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফিরাতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৮

৭.হযরত কাতাদাহ র. বলেন–

^ List

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم– ٦٩٠٧ واسناده صحيح.

অর্থ: হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন–বিত্র নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফিরানো যাবে না। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৭

৮. হযরত আবুয যিনাদ র. বলেন–

عَنْ السَّبْعَةِ ، سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، فِي مَشْيَخَةٍ سِوَاهُمْ أَهْلِ فِقْهٍ وَصَلَاحٍ وَفَضْلٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا .فَكَانَ مِمَّا وَعَيْتُ عَنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ فَهَذَا مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَائِهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠٧/١ وقال العينى فى نخب الافكار ٢٨٩/٣ :رجاله ثقات. وقال النيموى فى آثار السنن صـــ ٢٠٤ والبنورى فى معارف السنن ٢٢٧/٤ وابوابوفا الافغانى فى التعليق على كتاب الآثار ٣٢٢/١: اسناده حسن.

অর্থ: আমি মদীনার সাত ফকীহ, অথাৎ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, উরওয়া ইবনে যুবাইর , আবু বকর ইবনে আব্দুররহমান, খারিজা ইবনে যায়েদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার– এর যুগ পেয়েছি। তাছাড়া আরো অনেক শায়খের যামানা পেয়েছি, যারা ইলম ও তাকওয়ায় অনন্য ছিলেন। কখনো তাদের মধ্যে মতভেদ হলে তাদের অধিকাংশের মত অনুযায়ী কিংবা প্রাজ্ঞতার বিচারে যিনি অগ্রগণ্য তার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হত। এই মূলনীতি অনুসারে তাদের যে সব সিদ্ধান্ত আমি ধারণ করেছি তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– তাঁরা সকলে একমত হয়েছেন, বিত্র নামায তিন রাকাত; আর শেষ রাকাতেই কেবল সালাম ফিরাবে। তহাবী ২/২০৭

৯.হযরত সুফইয়ান ছাউরী র. তাঁর অনুসরণীয় পূর্বসূরি মহামনীষীদের বিত্র নামাযের বিবরণে বলেন–

كانوا يستحبون أن يقرأ ، في الركعة الأولى : سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون ثم يتشهد ، وينهض ، ثم يقرأ في الثالثة : قل هو الله أحد . رواه ابن نصر فى صلاة الوتر ص. ٢٧٩ وقال الحافظ فى نتائج الافكار ٢/١١٤ و ٢/٥٠٣ :اخرج محمد بن نصر بسند صحيح عن سفيان الثورى به.

অর্থ: তাঁরা তিন রাকাত বিত্‌রের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন পড়তেন। তারপর বসে তাশাহহুদ পড়ে আবার উঠে দাঁড়াতেন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ. ২৭৯

গ.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিত্‌র নামায ছিল মাগরিবের নামাযেরই অনুরূপ। অর্থাৎ দুই বৈঠক ও এক সালামে তিন রাকাত। তবে পার্থক্য হল বিত্‌র নামাযের তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা মেলাতেন, যা মাগরিবের নামাযে নেই। আর দূয়ায়ে কুনূত বিত্‌র নামাযের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

১.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلاَثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ رواه الدارقطنى فى السنن برقم– ١٦٧٢.

ضعف بعضهم يحى بن زكريا و لم يصب. قال الحافظ فى اللسان: يحيى بن زكريا ابن ابى الحواجب عن الاعمش. قال الدارقطني ضعيف، قلت : يحتمل ان يكون الذي قبله انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات . فالاسناد حسن.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– দিনের বিত্‌র– মাগরিবের মত রাতের বিত্‌রও তিন রাকাত। দারাকুতনী হা.১৬৭২

এর সনদ হাসান– আমীন ছফদর, মজমুআ রাসায়েল ৩/৫৪

২.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন–

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل ..

رواه احمد فى المسند برقم- ٤٨٤٧ وقال شعيب:رجاله ثقات، رجال الشيخين وابن ابى شيبۃ فى المصنف برقم-٦٧٧٣ وعبد الرزاق برقم-٤٦٧٥

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- দিনের বিত্র হল মাগরিবের নামায। তোমরা রাতের নামাযকেও অনুরূপ বিত্র করে পড়। মুসনাদে আহমদ হা.৪৮৪৭ ইবনে আবীশাইবা ৪/৪ হা.৬৭৭৩,৬৭৭৮ আব্দুররাযযাক হা.৪৬৭৫

এর সনদ সহীহ, শোয়াইব আরনাউত।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.বলেন-

الْوِتْرُ ثَلاَثٌ ، كَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ.رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم- ٦٧٧٩ وقال فى مجمع الزوائد- ٣٤٥٥ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

অর্থ: দিনের বিত্র- মাগরিবের মত রাতের বিত্রও তিন রাকাত । ইবনে আবী শাইবা ৪/ হা.৬৭৭৯ আল মু'জামুল কাবীর হা.৯৪২১-৯৪২২ সনদ সহীহ, মাযমাইয যাওয়ায়েদ- হা.৩৪৫৫

উল্লেখ্য যে, বাইহাকী র.তাঁর সুনানে কুবরায় এর শিরোনাম দিয়েছেন-

باب مَنْ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ مَوْصُولاَتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيمٍ.

দুই বৈঠক ও এক সালামে এক সাথে তিন রাকাত বিত্র অধ্যায়।

৪.হযরত উকবা ইবনে মুসলিম বলেন-

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ قَالَ : صَدَقْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ .رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١٩٧/١ واسناده صحيح.

অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞেস করলাম-বিত্র নামায সম্পর্কে। তিনি বললেন- তুমি দিনের বিত্র দেখনি? বললাম হাঁ, মাগরিবের

নামায। বলেন, ঠিক বলেছ। (রাতের বিত্‌রও তার মতই)। তহাবী ২/১৯৭ সুনানে কুবরা হা.৪৯৮৫

৫.হযরত হাসান বসরী র. বলেন–

كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب.رواه عبد الرزاق برقم– ٤٦٥٩، ٤٦٦٠

অর্থ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. (যাকে উমর রা. তারাবীহ ও বিত্‌রের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন) তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন এবং তাতে মাগরিবের মতই তৃতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৪৬৫৯-৪৬৬০ এর সনদ সহীহ।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. ছিলেন উমর রা. কর্তৃক নির্ধারিত রমযান মাসে তারাবীহ ও বিতর নামাযের ইমাম। মুক্তাদির নামায ইমামের নামাযের মতই হয়। তাই বলা যায়, অসংখ্য আনছার-মুহাজির সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর পিছনে মাগরিবের নামাযের মতই এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। কেউ এতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি।

৬.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

الوتر كصلاةِ المغرب. رواه محمد فى المطأ ص.١٥٠ وفى كتاب الحجة على اهل المدينة.١/١٣٦

অর্থ: বিত্‌র নামায মাগরিবেরই অনুরূপ। মুয়াত্তা মুহাম্মদ পৃ.১৫০ কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ ১/১৩৬

৭.হযরত ছাবেত আল বুনানী র.বলেন–

صليت مع أنس وبت عنده قال : فرأيته يصلى مثنى مثنى ، حتى إذا كان في آخر صلاته أوتربثلات مثل المغرب رواه عبد الرزاق برقم–٤٦٣٦ وابن نصرفى صلاة الوتر صـــ ٢٧٠

অর্থ: আমি হযরত আনাস রা. এর ঘরে রাত্রি যাপন করেছি এবং তাঁর সাথে নামায পড়েছি। তাঁকে দেখেছি রাতে দুই দুই রাকাত করে নামায পড়েছেন এবং

সব শেষে মাগরিবের নামাযের মত তিন রাকাত বিত্‌র পড়লেন। মুসান্নাফে আব্দুররাযযাক হা.৪৬৩৬ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী- পৃ. ১২৩

৮.হযরত যিয়াদ ইবনে আবী মুসলিম র.বলেন–

سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ ، وَخِلاَسًا عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالاَ : اَصْنَع فِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم–٦٩٠٩

অর্থ: আমি প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবুল আলীয়া ও খিলাস র.কে জিজ্ঞেস করলাম–বিত্‌র নামায কিভাবে পড়ব ? তাঁরা উভয়ে বললেন– মাগরিবের নামাযে যা যা কর বিত্‌র নামাযেও তাই করবে। ইবনে আবী শাইবা হা.৬৯০৯

৯.হযরত আবু খাল্‌দা তাবেয়ী আবুল আলীয়াকে বিত্‌র নামাযের তরীকা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন–

عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ ، وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ .رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٠٦/١ وقال العينى فى نخب الافكار ٢٧٩/٣ رجاله ثقات. قال البنورى فى معارف السنن ٢٢١/٤ والافعانى فى تعليق الآثار ٣٢٣/١: اسناده صحيح. واخرجه ابن نصر فى صلاة الوتر صـــ ٢٧٩

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন– বিত্‌র নামায মাগরিবের নামাযের মতই; কেবল পার্থক্য হল আমরা বিত্‌রের তৃতীয় রাকাতে কেরাত পড়ি (যা মাগরিবে নেই)। এটি রাতের বিত্‌র, আর মাগরিব হল দিনের বিত্‌র। তহাবী ১/২০৬ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭৯ । এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য– নুখাবুল আফকার ৩/২৭৯

উপরে (গ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস ও আছার থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর থেকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত সাহাবীদের বিত্‌র নামায ছিল মাগরিবের মত–দুই বৈঠক ও এক সালামে এক সাথে তিন রাকাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ বলে থাকেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের মত বিত্‌র পড়তে নিষেধ করেছেন, তাই বিত্‌র এক

রাকাত পড়বে। আর তিন রাকাত পড়লেও দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে, অথবা দুই রাকাত পর না বসে দাঁড়িয়ে যাবে।

বিত্‌রের দুই রাকাতে মাগরিবের মতই বৈঠক হবে কিন্তু সালাম ফিরাবে না; এর দলিল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিত্‌রকে মাগরিবের নামাযের মত পড়তে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে যথার্থ কথা হল– বিত্‌রের ক্ষেত্রে শরীয়তের কাম্য এই যে, তা কিছু নফল নামায পড়ার পর আদায় করা। এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب و لكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك.رواه الحاكم فى المستدرك برقم–١١٣٧ والبيهقى فى السنن الكبرى ٣/٣١–٣٢

অর্থাৎ তোমরা শুধু তিন রাকাত বিত্‌র পড়ো না, এতে মাগরিবের মত হয়ে যাবে; বরং পাঁচ, সাত, নয়, এগার বা এরও অধিক রাকাতে বিত্‌র পড়ো। আলমুসাতদরাক ১/৩০৪ হা.১১৩৭ সুনানে কুবরা বাইহাকী ৩/৩১, ৩২

অর্থাৎ বিত্‌র এর আগে কিছু নফল অবশ্যই পড়–দুই, চার, ছয়, আট, যত রাকাত সম্ভব হয় পড়ে নাও। (বিত্‌র অধ্যায়ের (ক) এর দ্বিতীয় হাদীসে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন, এবং দশ ও তিন– বিভিন্ন সংখ্যায় রাতের নামায পড়তেন, যেখানে তিন রাকাত ছিল বিত্‌র।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিত্‌র নামাযের প্রত্যক্ষদর্শী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন–

لَا تُوتَر بِثَلَاثٍ بُتْرٍ ، صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم–٦٨٩٨

অর্থাৎ শুধুই তিন রাকাত বিত্‌র পড়ো না, এটি অপূর্ণাঙ্গ, বরং এর পূর্বে দুই বা চার রাকাত পড়ে নাও। ইবনে আবী শাইবা, হা.৬৮৯৮

নবীজীর বিত্‌র নামাযের প্রত্যক্ষদর্শী অপর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا ، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا .رواه الطحاوى ف شرح معانى الآثار ٢٠٣/١

অর্থাৎ রাতে শুধুই তিন রাকাত নামায পড়া আমি পছন্দ করি না। বরং অন্তত পাঁচ থেকে সাত রাকাত পড়া উচিত। ইমাম তহাবী র. এই বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন–

فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ أَنَّهُ يُوتِرُ وِتْرًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَطَوُّعٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ ، إِمَّا رَكْعَتَانِ وَإِمَّا أَرْبَعٌ .

অর্থাৎ, তিনি আগে কোন নফল নামায না পড়ে কেবলই তিন রাকাত বিত্র পড়াকে অপছন্দ করেন। তাঁর মতে বিত্রের পূর্বে অন্তত দুই বা চার রাকাত নফল নামায পড়া উচিত। তাহাবী ১/২০৩

খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের যুগে সাহাবা-তাবেয়ীনের বিত্র নামাযঃ

খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাধারণত তাদের যুগে সাহাবা-তাবেয়ীনের বিতর নামাযের রাকাত সংখ্যা ছিল তিন। এবং তা ছিল মাগরিবের নামাযের মত এক সালামে। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা. থেকে বিতর সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তাঁর এর এই যামানার বিতর নামায ছিল হযরত উমর রা. এর বিতরের মতই। এর প্রমাণ, হযরত আবুবকরের দাফন সম্পন্ন করার পরই উমর রা. উপস্থিত সঙ্গিদের নিয়ে বিতর পড়েছেন এক সালামে তিন রাকাত। তখনো উমর রা. খলীফা হননি। যদি তাঁর বিতর আবু বকরের বিতরের অনুরূপ না হত তাহলে সঙ্গিরা অবশ্যই প্রশ্ন তুলতেন।

অতঃপর উমরের খেলাফতের যামানায় তারাবীহ ও বিতরের ইমাম ছিলেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব। তিনি যেহেতো উমর রা. কর্তৃক নির্ধারিত ইমাম তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিতর হবে উমর রা. এর মত। তদুপরি একথাও প্রমাণিত যে, হযরত উবাই মাগরিবের নামাযের মতই বিতর পড়তেন তিন রাকাত (আব্দুররাযযাক হা.৪৬৫১)। আর তাঁর পিছনেই বড় বড় সাহাবা-তাবেয়ীন সকলেই নামায পড়েছেন তাঁরই মত। অতঃপর হযরত আলী রা. খেলাফত আমলেও তিনি লোকদের ইমামতি করেছেন আর বিতর পড়েছেন তিন রাকাত। (সুনানুল কুবরা– ২/৪৯৬ হ.৪২৪৫ ফাজাইলুল আওকাত, বাইহাকী– ১/৬২ হা.

১১৯)। তাঁর পিছনেও অসংখ্য সাহাবা-তাবেয়ী নামায পড়েছেন তাঁরই মত। মধ্যবর্তী খলীফা হযরত উসমান রা. যামানায় বিতর ছিল অনুরূপ। কারণ হযরত উমর রা. এর যুগ থেকেই নিয়মিত রমযানে তারাবীহের জামাত হত। রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত যে, এতে তারাবীহের রাকাত সংখ্যায় কম বেশী হলেও বিতর সর্বাবস্থায়ই ছিল তিন রাকাত। এ বিষয়ে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া র. (মৃত.৭২৮) বলেন–

فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب، كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث . وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة، ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين، وأوتروا بثلاث، ... انتهى. مجموع الفتاوى ٢٧٢/٢٢

অর্থ: হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'বকে ইমাম নির্ধারণ করে (তারাবীহের) জামাত শুরু করলেন। তখন তিনি বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তেন, অতঃপর তিন রাকাতে বিতর পড়তেন। তিনি যে পরিমাণ রাকাত বেশী পড়তেন সে পরিমাণে কেরাত ছোট করতেন। কারণ এটি মুসল্লিদের জন্য দীর্ঘ রাকাত পড়ার তুলনায় সহজ। এর পর সালাফের একদল তারাবীহ পড়তেন চল্লিশ রাকাত আর বিতর তিন রাকাত। অপর দল তারাবীহ পড়তেন ছত্রিশ রাকাত আর বিতর তিন রাকাত। ...। মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/২৭২

অন্যত্র বলেন–

فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان ويوتر بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار و لم ينكره منكر. كذا في الفتاوى الكبرى.

অর্থ: বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তাঁর ইমামতিতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবীহ, অতঃপর তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তাই অনেক উলামা মনে করেন তারাবীহর এটিই প্রকৃত সুন্নত। কারণ তিনি অনেক মুহাজির-আনছারের সামনে এ নামায পড়েছেন। তাদের কেউ এর বিরোধিতা করেননি বা ভুল আখ্যা দেননি। আল ফাতাওয়াল কুবরা–২/২৪৫

বলাবহুল্য যে, তাঁর বিতর নামাযও সকল সাহাবার সামনেই ছিল। কিন্তু কেউ এর কোন সমালোচনা বা এতে কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। তাহলে কি এটিকেও সুন্নত বলা যায় না।

মোট কথা উপরোক্ত হাদীস ও আছার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নিয়মে বিত্‌র পড়েছেন এবং পড়তে আদেশ করেছেন। তাঁরপর খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা-তাবেয়ীনও এভাবে বিতর পড়েছেন। মক্কা-মদীনা ও ইরাকেও এনিয়মেই বিত্‌র আদায় করা হত। পরবর্তীতে মদীনার প্রসিদ্ধ সাত ফকীহ (ফুকাহায়ে সাব'আ) ও এ নিয়মের উপর একমত ছিলেন। ফলে আহলে মদীনা তথা মদীনা বাসীও তাই গ্রহণ করেন। ইলমে নববীর অন্যতম ক্ষেত্র ইরাকও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ইরাকে অবস্থানকারী সহাবায়ে কেরাম বিশেষত খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উভয়ই এনিয়মে বিত্‌র পড়তেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বিত্‌র নামাযের এ নিয়ম অত্যন্ত শক্তিশালী ও অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা ও কর্মধারার মাধ্যমে চলে এসেছে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় রাকাতে কেরাত সমাপ্ত করার পর রুকু করার পূর্বে দুআয়ে কুনূত পড়তেন:

১.হযরত আসিম আহ্‌ওয়াল বলেন—

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْقُنُوت فِي الصَّلَاة فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَال قَبْلَهُ قُلْتُ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْك أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ قَبْلَهُمْ فَظَهَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. رواه البخارى فى الصحيح- ٤٠٩٦

অর্থ: আমি হযরত আনাস রা. কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুনূত আছে । আমি জিজ্ঞেস করলাম রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন–রুকুর আগে। আমি বললাম একজন আমাকে বলেছেন, আপনি রুকুর পরে কুনূত পড়ার কথা বলেছেন? তিনি বললেন– সে ভুল বলেছে । রুকুর পরে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক মাস কুনূত পড়েছেন। (যা ছিল মূলত কুনূতে নাযেলা)। সহীহ বুখারী হা.৪০৯৬

২.হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন–

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـــ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِبِـــ قُلْ يَا أَيُّهَاالْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـــ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.رواه النسائى فى السنن برقم-١٦٩٩والطحاوى فى مشكل الآثار ١١/٣٦٨ وصححه ابن القطان فى الوهم والايهام ٣/٣٨٣ والالبانى ايضا فى ارواء الغليل ٢/١٦٧ كما سبق.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। এবং রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন । সুনানে নাসায়ী ১/১৯১ হা.১৬৯৯ মুশকিলুল আছার ১১/৩৬৮

হাদীসটি সহীহ– আল ওয়াহামু ওয়াল ইহাম ৩/৩৮৩ (হাদীসটি তিন রাকাতে তিন সূরা পড়া শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে)

অনুরূপ সাহাবায়ে কেরামও বিত্‌র নামাযে রুকুর পূর্বে দূয়া কুনূত পড়তেন ; যা সহীহ সনদে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের আস্থাভাজন আলেম স্বয়ং আলবানী সাহেব বলেন–

وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتي بعد حديث ويشهد له أثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه في الحديث الآتي بإذن الله تعالى. والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر وهو الموافق الحديث الآتي انتهى من إرواء الغليل ٢/١٦٦

অর্থ:... সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়েছেন। যার আলোচনা একটি হাদীস পরেই আসবে। কিবারে সাহাবাদের থেকে বর্ণিত অনেক আছার এর পক্ষে দলিল। ... সারকথা হল,সাহাবীদের থেকে সহীহ সূত্রে এটিই প্রমাণিত যে, বিত্‌রের কুনূত রুকুর পূর্বে। ইরওয়উল গালীল ২/১৬৬

কেরাত সমাপ্তির পর তাকবীর বলে দুয়া কুনূত পড়বে:

হযরত মাসরূক,আসওয়াদ ও ইবনে মাসউদ রা.এর আরো কতিপয় শিষ্য বলেন–

كان عبد الله « لا يقنت إلا في الوتر ، وكان يقنت قبل الركوع ، يكبر إذا فرغ من قراءته حين يقنت » رواه الطحاوفى مشكل الآثار ١١/٣٧٤ وابن ابى شيبة برقم-٧٠٢١ (وكذا ثبت عن اصحابه ايضا, واسناده صحيح, اقر به الالبانى فى الارواء ٢/١٦٦) وكذاروى عن على عند ابن ابى شيبة ٥/٣٩ برقم-٧١١٣ وغيره .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শুধু বিত্‌র নামাযেই কুনূত পড়তেন। তাঁর কুনূত ছিল রুকুর পূর্বে। কেরাত সমাপ্ত করার পর তাকবীর বলে কুনূত শুরু করতেন। মুশকিলুল আছার ১১/৩৭৪ ইবনে আবী শাইবা হা.৭০২১ এর সনদ সহীহ। তাঁর শিষ্যবর্গও অনুরূপ আমল করতেন। এবং হযরত আলী রা. থেকে অনুরূপ আমল বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবী শাইবা হা.৭১১৩

ইমাম তহাবী র. এ দুটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন–

فكان هذا مما يعلم أن عليا وعبد الله لم يقولاه استنباطا ، ولا استخراجا ، إذ كان مثله لا يقال بالاستنباط ولا بالاستخراج ، وإنما يقال بالتوقيف الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٧٤

অর্থ: এ থেকে বুঝা যায় হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা. এ কথা নিজেদের থেকে বলেন নি, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে বলেছেন।

কারণ, ইবাদতের এ বিষয়গুলো নিজ থেকে বলার নয়। মুশকিলুল আছার ১১/৩৭৪

দুআয়ে কুনূত:

হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে একাধিক দুআ এসেছে। তন্মধ্যে

ক. "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তা'ঈ নুকা ..."

মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী বর্ণনা করেন–

وروينا عن عمر: أنه كَانَ يقول في القنوت في الوتر: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك وَلا نكفرك ونخلع، ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. رواه ابن نصر فى صلاة الوتر

অর্থাৎ হযরত উমর রা. বিতরের কুনূতে পড়তেন– "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈ নুকা ..." দুআটি।

হযরত আবু আব্দুর রহমান বলেন–

عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.رواه ابن ابى شيبة فى المصنف برقم–٦٩٦٥

শব্দের সামান্য ব্যতিক্রম সহ অন্যান্য বর্ণনায়ও এ দুআ এসেছে। যেমন: এক বর্ণনায়–ونؤمن بك ونتوكل عليك، এ বাক্য দুটি বর্ধিত এসেছে। ইবনে আবী শাইবা ১৫/৩৪৪

তহাবীর এক বর্ণনায় (১/১৭৭) ونشكرك শব্দটিও রয়েছে।

এই বর্ণনা গুলির আলোকে পূর্ণ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، ونؤمن بك ونتوكل عليك، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، ونشكرك ولاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমার কাছেই ক্ষমা প্রর্থনা করি, তোমার প্রতিই ঈমান রাখি এবং তোমারই উপরই ভরসা করি। আর তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকরগোযারী করি, নাশোকরী করি না। যে তোমার অবাধ্য হয় তাকে আমরা পরিত্যাগ করি ও তার সংশ্রব বর্জন করি। ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি, তোমাকেই সাজদা করি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হই। আর তোমারই দাসত্ব অবলম্বন করি। আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি, তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদের উপর পতিত হবে।

সুনানে বায়হাকীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত জিব্রীল আ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুনূত শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর শব্দের সামান্য তারতম্যসহ উপরোক্ত দুআটি উল্লেখিত হয়েছে। (বাইহাকী: ২/২১০ আল মুদাওয়ানা ১/১০১ বর্ণনাটি মুরসাল এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য–নাতাইযুল আফকার লি ইবনে হাজার ২/১১১)

হযরত আনাস, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী, আতা, তাউস, ইবনুল মুসায়্যিব র. প্রমুখ বিত্রে এ দুআটিই পড়তেন। বরং সাহাবাদের অনেকেই এই দুআ পড়তেন। হযরত আমর বলেন– তাবেয়ী হাসান বসরী র. এদুআটিই পড়তেন। তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করল, এই দুআর অতিরিক্ত আর কিছু পড়া যাবে কি? তিনি উত্তরে বললেন–

لا انهاكم ولكني سمعت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزيدون على هذا شيئا. ويغضب اذا ارادوه على الزيادة. روا عبد الرزاق في المصنف٣/١١٦

অর্থাৎ তোমাদেরকে আমি নিষেধ করব না; তবে আমি রসুলের সাহাবীদের এর অতিরিক্ত কিছু পড়তে দেখিনি। ...। আব্দুররাযযাক ৩/১১৬

তাই ফুকাহায়ে আহনাফ ও ইমাম মালিক র. এই দুআকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনে আব্দিল বার র. বলেন–

قال الكوفيون ومالك: وليس في القنوت دعاء موقت، ولكنهم يستحبون الا يقنت الا بقولهم : اللهم انا نستعينك...انتهى الاستذكار ٣٠٢/٦

অর্থ: কুফার অধিবাসী আহলে ইলমগণ ও ইমাম মালেক বলেন– দুআ কুনূত একেবারে সুনির্দিষ্ট নয়। তবে তাঁরা এই দুআটি পড়া উত্তম মনে করেন।

খ.হযরত হাসান ইবনে আলী রা. বলেন–

^ List

علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمان أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فمين هديت وعافني فيمن عافيتن وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.رواه الترمذى فى السنن برقم-٤٦٤ وابو داود فى السنن ٥٢٦/١ والنسائى ٢٥٢/١ وابن ماجة ١٨٥/١ واحمد فى المسند برقم-١٧١٨ وقال شعيب : اسناده صحيح.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিত্রে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন– (অর্থ:) ইয়া আল্লাহ! যাদেরকে আপনি হেদায়েত দিযেছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও হেদায়েত দিন, যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও নিরাপত্তা দিন, যাদেরকে আপনার তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করুন, আমাকে যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন, আর আমাকে আপনার অকল্যাণের ফায়সালা থেকে হেফাযতে রাখুন। কেননা আপনিই ফায়সালাকারী, আপনার ওপর কোনো ফয়সালাকরী নেই। নিঃসন্দেহে যাকে আপনি সাহায্য করেন সে কখনো লাঞ্ছিত হয় না; আর যাকে আপনি সাহায্য-বঞ্চিত করেন সে কখনো সম্মান লাভ করে না। হে আমাদের রব, আপনি মহান, সমুচ্চ! (সুনানে আবু দাউদ: ১/৫২৬; সুনানে নাসায়ী: ১/২৫২; জামে তিরমিযী: ১/১০৬ হা.৪৬৪; সুনানে ইবনে মাজা: ১/১৮৫ মুসনাদে আহমদ হা.১৭১৮)

বরং নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিত্রে এ দুআটি পড়েছেন। (দ্র.সুনানে কুবরা-বাইহাকী, ২/২১০ মুখতাসারু সালাতুল বিতর লিল মারওয়াযী-২৯৬-২৯৭)

তাই অনেকে উভয় দুআই পড়তেন।

হযরত সুফইয়ান ছাউরী বলেন–

كانوا يستحبون أن يجعلوا ، في قنوت الوتر هاتين السورتين : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نخشى عذابك ونرجو رحمتك ، إن عذابك بالكفار ملحق ، وهذه الكلمات : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، لا يذل من واليت

تبارکت ربنا وتعالیت ، ویدعو بالمعوذتین.رواه ابن نصر فی صلاة الوتر صـــ ۳۰۱ وقال الحافظ فی نتائج الافکار ۲/۱۱٤، ۵۰۳: اخرجه ابن نصر بسند صحیح... انتهی.

অর্থ: আমি আমার পূর্বসূরিদের দেখেছি তাঁরা বিত্‌রে উপরোক্ত দুটি দুআ পড়াকেই উত্তম মনে করতেন। সালাতুল বিত্‌র পৃ.৩০১

মুসান্নাফ গ্রন্থকার ইমাম আব্দুররাযযাক র.ও এ তরিকা অবলম্বন করেছেন (আল মুসান্নাফ৩/১১৬)। ইমাম নববী র. আমাদের অনেকেই বলেন– উভয় দুআ একত্রে পড়াটাই উত্তম (শরহুল মুহাযযাব ৩/৪৭৫-৪৭৮)।

পরবর্তী হানাফী ফকীহদের অনেকেই উভয় দুআ একত্রে পড়াকে পছন্দ করেছেন। দ্র. মাবসূতে সারাখসী ১/১৬৫ বাদয়েউস সানায়ে ২/২৩২ আল বাহরুর রায়েক ২/৪১-৪২ আল মুহীতুল বুরহানী ২/২৬৮ গুন্‌ইয়াতুল মুসতামলী পৃ.৪১৭ জামির রুমুজ ১/২৫২ মাজমাউল আনহুর ১/১৯১ মারাকিল ফালাহ পৃ.২০৯ তাহতাবী আলাদদুর ১/২৮০ আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/১১১

জুমআর আগের ও পরের সুন্নত

আমাদের লামাযহাবী ভাইয়েরা আজকাল কিছু কিছু মিডিয়ায়ও প্রচার শুরু করেছে, জুমআর আগে পরে কোন সুন্নত নাই। তাদেরকে না চেনার কারণে অনেকে ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। পূর্বসূরিগণের যুগে এ প্রবণতা ছিলনা। আতা ইবনে আবী রাবাহ র. জুমআর পূর্বে ১২ রাকাত পড়তেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৫২১)। এমনিভাবে উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. অন্যদেরকে জুমআর পূর্বে দশ রাকাত পড়ে নিতে বলতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৪০৪)

যাহোক, জুমআর সুন্নত সম্পর্কে হাদীসগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ». أخرجه مسلم (٨٥٧)

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করলো, অতঃপর জুমআয় আসলো, এবং তৌফিক অনুসারে নামায পড়লো, এরপর ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ রইলো এবং তার সঙ্গে নামায আদায় করলো তার পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৮৫৭।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ». أخرجه مسلم (الصلاة بعد الجمعة ، ٨٨١) وفيه :قال سهيل: فإن عجل بك شيئ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমআ (ফরজ) পড়ে তখন সে যেন 'বা'দাল জুমআ' চার রাকাত পড়ে নেয়। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৮৮১। সুহায়ল র. বলেন, ত্বরা থাকলে মসজিদে দুই রাকাত, ঘরে ফিরে দুই রাকাত পড়ো।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.
أخرجه الجماعة.

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পরে দুরাকাত পড়তেন। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৯৩৭; মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৮৮২; আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১১৩২; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৫২১; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ১৪২৮; ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ১১৩১।

৪. হযরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে আতা র. বলেছেন,

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَفْعَلُ ذَلِكَ.
أخرجه أبو داود (١١٣٠) وقال العراقي: إسناده صحيح. آثار السنن صـ ٣٠٢

অর্থ: তিনি যখন মক্কা শরীফে অবস্থান করতেন এবং জুমআর নামায পড়তেন, তখন সামনে অগ্রসর হয়ে দুই রাকাত পড়তেন, এরপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে চার রাকাত পড়তেন। আর যখন মদীনা শরীফে জুমআ আদায় করতেন তখন ঘরে ফিরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন। মসজিদে পড়তেননা। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১১৩০; আল্লামা ইরাকী বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

৫. আতা র. বলেন,

عن عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا.

أخرجه أبو داود (١١٣٣ –الصلاة بعد الجمعة) وأصل الحديث في الترمذي أيضا باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها.

অর্থ: তিনি হযরত ইবনে উমর রা.কে দেখেছেন, তিনি জুমআর নামাযের পর মুসল্লা থেকে একটু সরে গিয়ে দুই রাকাত পড়লেন। এরপর আরেকটু সরে চার রাকাত পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আতা র.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হযরত ইবনে উমর রা. কে কতবার এমন করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, অনেকবার। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১১৩৩।

৬. জাবালা ইবনে সুহায়ম র. হযরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বলেছেন,

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. أخرجه الطحاوي إسناده صحيح (آثار السنن)

অর্থ: তিনি 'কাবলাল জুমআ' (জুমআর পূর্বে) চার রাকাত পড়তেন। মাঝখানে সালাম ফেরাতেন না। জুমআর ফরজের পর তিনি প্রথমত দুই রাকাত পরে চার রাকাত পড়তেন। তাহাবী শরীফ। এর সনদ সহীহ।

৭. নাফে র. বলেন,

كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الامام . أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٠٣) وفي رواية أبي داود(١١٢٨) كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته.

অর্থ : হযরত ইবনে উমর রা. জুমআর অনেক আগেই মসজিদে চলে যেতেন এবং ইমাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত লম্বা নামায পড়তেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৪০৩।

আবূ দাউদ শরীফে আছে, তিনি জুমআর পূর্বে লম্বা নামায পড়তেন এবং জুমআর পর ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন।

৮. কাতাদা র. বলেন,

أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات ، قال أبو إسحاق : وكان علي يصلي بعد الجمعة ست ركعات ، وبه يأخذ عبد الرزاق . أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٤) ورواه الطبراني وإسناده صحيح قاله النيموي في آثار السنن.

অর্থ: হযরত ইবনে মাসউদ রা. কাবলাল জুমআ চার রাকাত ও বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়তেন। আবূ ইসহাক র. বলেন, হযরত আলী রা. বা'দাল জুমআ ছয় রাকাত পড়তেন। আব্দুর রাযযাক র. এ অনুসারেই আমল করতেন।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং৫৫২৪। তাবারানী শরীফ। এর সনদ সহীহ।

৯. আবূ আব্দুর রহমান সুলামী র. বলেন,

كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا ، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا . أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥) وإسناده صحيح.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে কাবলাল জুমআ চার রাকাত, বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিতেন। অবশেষে হযরত আলী রা. যখন আমাদের এখানে (কূফায়) আসলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বা'দাল জুমআ দুই রাকাত তারপর চার রাকাত (মোট ছয় রাকাত) পড়ার আদেশ দিয়েছেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৫২৫। এন সনদ সহীহ।

১০. আবূ আব্দুর রহমান র. বলেন,

قدم علينا ابن مسعود فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذ بقول علي وتركنا قول عبد الله. رواه ابن أبي شيبة (٥٤١٠) ورواه الطحاوي وإسناده صحيح.(آثار السنن)

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ রা. আমাদের নিকট (কূফায়) আসলেন। তিনি আমাদেরকে বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর যখন হযরত আলী রা. আমাদের নিকট আসলেন, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন ছয় রাকাত পড়তে। আমরা তখন হযরত আলী রা. নির্দেশ গ্রহণ করলাম এবং

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর কথা ছেড়ে দিলাম। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৪১০; তাহাবী শরীফ, এর সনদ সহীহ।

চিন্তা করুন, এক সাহাবীর আদেশে দীর্ঘদিন চার রাকাত পড়ে আসলেও আরেকজনের নির্দেশে তারা সেটা ছেড়ে দিয়ে ছয় রাকাত পড়তে লাগলেন। তারা একথা বলেননি, জুমআর আগে-পরেতো কোন সুন্নত নাই। তাই, আমরা এটা পড়বোনা। আব্দুর রাযযাক র.ও তো আহলে হাদীস ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনিই বা ছয় রাকাতকে অবলম্বন করলেন কেন? এসব থেকেও কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল ও শিক্ষা প্রমাণিত হয় না? সুন্নত যদি নাই থাকে তবে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী রা. আদেশ দিবেন কেন?

১১. আবূ বকর র. তদীয় পিতা আবূ মূসা আশআরী রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات .أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٠٣)

অর্থ: তিনি বা'দাল জুমআ ছয় রাকাত পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৪১৩।

১২. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. বা অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন ,

أن عمران بن حصين صلى مع زياد الجمعة ، ثم قام فصلى بعدها أربعا ،

أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥)

অর্থ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. যিয়াদের সঙ্গে জুমআ আদায় করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়লেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৫৩০।

১৩. ইবরাহীম নাখায়ী র. বলেন,

كانوا يصلون قبلها أربعا وبعدها أربعا .أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٠٥،٥٤٢٢)

অর্থ: সাহাবায়ে কেরাম কাবলাল জুমআ চার রাকাত, বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৪০৫,৫৪২২।

১৪. হযরত আলী রা. বলেছেন,

من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا. أخرجه الطحاوي وإسناده صحيح (آثار السنن)

অর্থ: যে ব্যক্তি জুমআর পরে নামায পড়বে সে যেন ছয় রাকাত পড়ে। তাহাবী শরীফ। এর সনদ সহীহ।

হাফেজ ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وروى الست ركعات عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم

অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এসেছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বা'দাল জুমআ পড়বে, সে যেন চার রাকাত পড়ে। আর অনেক সাহাবী থেকে ছয় রাকাতের কথাও বর্ণিত রয়েছে।

অনেকে আবার জুমআর সুন্নতকে জোহরের আগে-পরের সুন্নতের উপর কিয়াস করেছেন। ইমাম বুখারী র.ও তাই করেছেন। তিনি জুমআর পূর্বের ও পরের নামায অনুচ্ছেদে জোহরের পূর্বাপর সুন্নতের হাদীসটি উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জোহরে যেমন সুন্নত আছে, জুমআরও তেমনই সুন্নত আছে। ইমাম নববীও এভাবেই কেয়াস করেছেন।

শায়খ মুহাম্মদ আওওয়ামা মাদ্দা জিল্লুহু আরেকভাবে জুমআর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চার রাকাত পড়ার কথা প্রমাণ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব রা. এর বর্ণিত হাদীসে আছে:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر — أي :قبل صلاة فريضتها - وقال أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أخرجه أحمد ٣/٤١١ والترمذي (٤٧٨) وهذا المعني مذكور في حديث أبي أيوب عند ابن أبي شيبة (٥٩٩٢) ولفظه: أن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে - অর্থাৎ জোহরের ফরজ পড়ার পূর্বে - চার রাকাত নামায পড়তেন। তিনি বলেছেন, এ সময়টায় আসমানের দ্বার খোলা হয়। আর এ সময় আমার নেক

আমল উপরে উঠুক, আমি তা পছন্দ করি। মুসনাদে আহমদ, ৩/৪১১; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৪৭৮। হযরত আবূ আইয়্যুব রা. এর হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে- সূর্য ঢলার সময় জান্নাতের দরজা খোলা হয়। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৯৯২।

হাদীস দুইটির সনদ সম্পর্কে শায়খ লেখেন,

فحديث أبي أيوب وحده بطرقه قوي وحديث عبد الله بن السائب كذلك حسن لذاته فازداد قوة.

অর্থাৎ শুধু আবূ আইয়্যূব রা. এর হাদীসটি তার সূত্রগুলোসহ বেশ মজবুত। আর আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব রা. এর হাদীসটি حسن لذاته। সুতরাং এতে আরো শক্তি বেড়ে গেল। পরিশেষে শায়খ বলেন,

فهذا المعنى هو حجة لمن يقول بسنية أربع ركعات قبل فرض الجمعة لأن فتح أبواب السماء أو الجنة مناط بزوال الشمس وهذا متحقق في يوم الجمعة وغيره. (المصنف لابن أبي شيبة: ٣/١١٥-١١٦)

অর্থাৎ যারা জুমআর ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতের কথা বলেন এ হাদীসটিই তার প্রমাণ । কেননা আসমান কিংবা জান্নাতের দরজা খোলাটা সূর্য ঢলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এ অবস্থা জুমআর দিন ও অন্যান্য দিনে সমানভাবে বিদ্যমান। দ্র, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার টীকা, ৩খ, ১১৫-১১৬পৃ।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর সুন্নত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ হাদীসে এবং বহু সাহাবী ও তাবিয়ী এর ফতোয়া ও আমল দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দেওয়া সুন্নত। কিন্তু আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা দেশের বিভিন্ন স্থানে এ সুন্নতের বিরোধিতা করে মানুষকে এই ধারণা দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে যে, ১২ তাকবীর দেওয়াই সুন্নত, ছয় তাকবীর সুন্নতের পরিপন্থী। এখানে আমরা প্রথমে ছয় তাকবীরের হাদীসগুলো পেশ করবো। পরে বার তাকবীরের হাদীসগুলোর অবস্থা সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরবো।

ছয় তাকবীর সম্পর্কিত হাদীস:

১. কাসেম আবূ আব্দির রহমান র. বলেন,

حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم عيد فكبر اربعا واربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٤٠٠ من طريق عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن الوضين بن عطاء عنه. قال الطحاوي: فهذا حديث حسن الإسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فان كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد يؤخذ فان هذا أولى ان يؤخذ به مما خالفه غيره.

অর্থ: আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ঈদের দিন নামায পড়লেন এবং চারটি করে তাকবীর দিলেন। নামায শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ভুলে যেয়োনা, জানাযার তাকবীরের মতো। এই বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে বাকী চার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। (তাহাবী শরীফ, ২খ, ৪০০ পৃ)

তাহাবী র. বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ চমৎকার। এর বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে হামযা, ওয়াদীন (وضين) ও কাসেম সকলেই হাদীস বর্ণনাকারী, সহীহ বর্ণনা পেশ করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী হাদীসগুলো (১২তাকবীরের হাদীস) যাদের সূত্রে বর্ণিত, এরা তাদের মতো সমালোচিত নয়।

সুতরাং এই অধ্যায়ে যদি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসই গ্রহণ করতে হয় , তবে এই হাদীসটি গ্রহণ করাই শ্রেয়।

২ . মাকহুল র. বলেন,

أخبرنى أبو عائشة جليس لأبى هريرة ان سعيد بن العاص سال أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر فى الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. أخرجه أبو داود (١١٥٣) وسكت عنه هو والمنذري ورواه أحمد في مسنده ٤١٦/٤ وابن أبي شيبة (٥٧٤٤)

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর একজন সঙ্গী আবূ আয়েশা র. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনুল আস রা. (কুফার গভর্নর) এসে হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় কিভাবে তাকবীর দিতেন? আবূ মূসা রা. বললেন, তিনি জানাযার মতো চার তাকবীর দিতেন। তখন হুযায়ফা রা. বললেন, আবূ মূসা সঠিক বলেছেন। আবূ মূসা রা. বললেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর দিতাম। আবূ আয়েশা র. বলেন, এসময় আমি সাঈদ ইবনুল আসের কাছে উপস্থিত ছিলাম। আবূ দাউদ শরীফ (১১৫৩), মুসনাদে আহমাদ ৪খ, ৪১৬পৃ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং (৫৭৪৪)

ইমাম আবূ দাউদ র. ও মুনযিরী র. দুজনই এই হাদীসের উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে হাদীসটি তাদের নিকট আমলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। নীমাবী র. বলেছেন, এর সনদ হাসান । (দ্র. আসারুস সুনান, ৩১৪ পৃ)

উল্লেখ্য, এই দুটি হাদীসে প্রথম রাকাতের তাকবীরে তাহরীমাসহ এবং ২য় রাকাতের রুকুর তাকবীর সহ চার তাকবীর উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী হাদীসগুলো থেকেও একথা পরিস্কার বোঝা যায়।

৩. আলকামা র. ও আসওয়াদ র. বলেছেন,

كان ابن مسعود رض جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الاشعري رض فسالهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والاضحى ، فجعل هذا يقول : سل هذا ، وهذا يقول : سل فقال له حذيفة :سل هذا – لعبد الله بن مسعود – فساله ، فقال ابن مسعود : يكبر اربعا ، ثم يقرا ، ثم يكبر ، فيركع ، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر اربعا ، بعد القراءة. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عنها. ٣/٢٩٣-٢٩٤ وإسناده صحيح. وهذا وان كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع لان مثل هذا لا يكون من جهة الرأي والقياس وقد وافق ابن مسعود جماعة من الصحابة.

অর্থ: হযরত ইবনে মাসউদ রা. বসা ছিলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন হযরত হুযায়ফা রা. ও আবূ মূসা আশআবী রা.। তাঁদের দুজনকে হযরত সাঈদ ইবনুল আস রা. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইনি বলতে লাগলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। আর উনি বললেন, এনাকে জিজ্ঞেস করুন। অবশেষে হযরত হুযায়ফা রা. তাঁকে বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। এই বলে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ইবনে মাসউদ রা. তখন বললেন, চার তাকবীর দেবে। অতঃপর কেরাত পড়বে। আবার তাকবীর বলে রুকু করবে, এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। পরে কেরাত পড়বে। কেরাতের পরে চার তাকবীর দেবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৩খ. ২৯৩-৯৪পৃ.। এর সনদ সহীহ। এটি সাহাবীর বক্তব্য হলেও মূলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই বক্তব্য। কারণ কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা এমনটা বলা অসম্ভব। তাছাড়া এক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. একা নন। অনেক সাহাবী তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

التكبير في العيدين اربعا كالصلاة على الميت. رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

অর্থ: জানাযার নামাযের মতো দুই ঈদে চার তাকবীর হবে। তাবারানী র. এটি উদ্ধৃত করেছেন। হায়ছামী র. বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগন সকলে বিশ্বস্ত।
(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৩৬৮)

৫. মাসরূক র. বলেন,

كان عبد الله يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولى واربع في الآخرة ويوالى بين القراءتين . أخرجه ابن أبي شيبة — وإسناده حسن.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে দুই ঈদের তাকবীর শেখাতেন। মোট নয় তাকবীর। প্রথম রাকাতে পাঁচ ও দ্বিতীয় রাকাতে চার। উভয় রাকাতের কেরাত একাধারে পড়বে। (অর্থাৎ উভয় রাকাতের কেরাতের মাঝে তাকবীর বলবে না। ইবনে আবী শায়বা এটি উদ্ধৃত করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৪৬)। এটির সনদ হাসান।

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

لما كان ليلة العيد ارسل الوليد بن عقبة إلى مسعود وأبي مسعود وحذيفة والاشعري فقال لهم ان العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله يقوم فيكبر اربع تكبيرات ويقرا بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارها ثم يركع ثم يقوم فيقرا فإذا فرغ من القراءة كبر اربع تكبيرات ثم يركع بالرابعة. أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن أشعث عن كردوس عنه (٥٧٥٤) وأخرجه نحوه الإمام محمد في كتاب الآثار صـــ ٢٠٥ وفي الحجة على أهل المدينة صـــ ٨٥ من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود ورواه الطبراني في الكبير من طريق زكريا ابن أبي زائدة عن أشعث عن كردوس ، قال الهيثمي: رجاله ثقات، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي بكر ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة والاشعري رضي الله عنهم فقال ان العيد غدا فكيف التكبير فقال ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال الاشعري وحذيفة رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن. ذكره ابن كثير بإسناد الطحاوي (تحت قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي) وقال: إسناد صحيح.

অর্থ: ওয়ালীদ ইবনে উকবা ঈদের রাতে হযরত ইবনে মাসউদ রা., আবূ মাসউদ রা. ও আবূ মূসা আশআরী রা. এর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আগামী কাল তো ঈদ, তাকবীর কিভাবে দিতে হবে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, নামাযে দাঁড়িয়ে চার তাকবীর দেবে, পরে সূরা ফাতিহা এবং মুফাসসাল থেকে এমন একটি সূরা পড়বে যা বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়। এরপর রুকু করবে। পরে (রাকাত শেষ করে) পুনরায় দাঁড়াবে। এবং কেরাত পাঠ করবে। কেরাত পাঠ শেষ হলে চারটি তাকবীর দেবে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৪; ইমাম মুহাম্মদ র. এর কিতাবুল আসার, পৃ,২০৫; কিতাবুল হুজ্জাহ , পৃ ৮৫; তাবারানী , আলমুজামুল কাবীর, (দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৩৬৭) হায়ছামী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগন বিশ্বস্ত; তাহাবী শরীফ ১খ, ৩১৯পৃ,। তাহাবীর সনদে ইবনে কাছীর র. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে। তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। (৩খ, ৫৬৪পৃ)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. যেমন ফতোয়া দিতেন, নিজেও ঠিক সেভাবে আমল করতেন। নিম্নের হাদীসটি তার প্রমাণ।

৭. আলকামা র. ও আসওয়াদ র. বলেন,

.... ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا اربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرا فإذا فرغ كبر اربعا ثم ركع . أخرجه عبد الرزاق ٣/٢٩٣ (٥٦٨٦) عن الثوري عن أبي إسحاق عنهما وابن أبي شيبة نحوه عن الشعبي (٥٧٤٧) والإمام محمد في الحجة صـــ ٨٥

অর্থ: হযরত ইবনে মাসউদ রা. দুই ঈদে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে চার তাকবীর বলতেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। দ্বিতীয় রাকাতে আগে কেরাত পড়তেন। কেরাত শেষ হলে চার তাকবীর বলে রুকু করতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৮৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৪৭; কিতাবুল হুজ্জাহ, ৮৫পৃ.।

৮. কাতাদা র. বলেন,

عن جابر بن عبد الله وسعيد ابن المسيّب قالا تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٥٦) وعبد الرزاق (٢٩٦/٣) عن إبراهيم بن يزيد عن جابر بن عبد الله وفيه : انه قال : التكبير في يوم العيد في الركعة الاولى اربعا وفي الآخرة ثلاثا.

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব র. দুজনই বলেছেন, তাকবীর হবে মোট নয়টি আর উভয় রাকাতের কেরাত হবে লাগাতার। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৩খ, ২৯৬পৃ।

৯. আব্দুর রাযযাক র. বলেছেন,

أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات والى بين القراءتين قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا فسالت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء.

أخرجه عبد الرزاق (٥٦٨٩) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد به (٥٧٥٧)

অর্থ: ইসমাঈল ইবনে আবিল ওয়ালিদ র. খালেদ আল হায্যা র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ র. থেকে। তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বসরায় ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর দিয়েছিলেন এবং উভয় রাকাতের কেরাত লাগাতার পড়েছিলেন। ঐ নামাযে আমি তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.ও অনুরূপ করেছিলেন। সে নামাযেও আমি উপস্থিত ছিলাম। ইসমাঈল র. বলেন, আমি খালেদ র. কে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত ইবনে আব্বাস রা. কিরূপ করেছিলেন? তখন তিনি আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন। মা'মার র. ও ছাওরী র. আবূ ইসহাক র. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ইবনে মাসউদ রা. এর নামাযের যে বিবরণ এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. এর নামাযও ছিল ঠিক তদ্রুপ। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৮৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৭। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

১০. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. হযরত আনাস রা. সম্পর্কে বলেছেন,

انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله : أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٦٠)عن يحيى بن سعيد عن أشعث عنه. وإسناده صحيح.

অর্থ: তিনি ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর বলতেন। এরপর ইবনে সীরীন র. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর নামাযের মতো করে বিবরণ দিলেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬০। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৬১. আব্দুর রাযযাক র. ইবনে জুরায়জ র. থেকে বর্ণনা করেছেন:

ان يوسف بن ماهك أخبرني ان ابن الزبير كان لا يكبر إلا اربعا في كل ركعة سواء ، يكبرهن في كل ركعتين ، سمعنا ذلك منه. المصنف ٣/٢٩١ (٥٦٧٦)

অর্থ: ইউসুফ ইবনে মাহাক র. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে , আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়জ রা. প্রত্যেক রাকাতে চার তাকবীরই বলতেন, এর বেশী বলতেননা। এভাবে উভয় রাকাতেই তিনি তাকবীর বলতেন। আমরা তার কাছ থেকেই শুনেছি। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৭৬। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

মোট ছয়জন সাহাবীর হাদীস সহীহ সনদে আমরা উল্লেখ করলাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়র রা. আনাস রা. জাবের রা. ও মুগীরা ইবনে শো'বা রা.। আর তিনজন সাহাবী অর্থাৎ হযরত আবূ মাসউদ রা. আবূ মূসা আশআরী রা. ও হুযায়ফা রা. ইবনে মাসউদ রা. এর মতকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং বলা চলে, নয় জন সাহাবী থেকে সহীহ হাদীসে ছয় তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, যেখানে নয় তাকবীর বলার কথা উল্লেখ আছে, সেখানে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ পাঁচ তাকবীর গণ্য করা হয়েছে। আর যে হাদীসে চার বলা হয়েছে সেখানে প্রথম রাকাতে রুকুর তাকবীর ও ২য় রাকাতে রাকাত শুরুর তাকবীরসহ চার ধরা হয়েছে।

ইমাম তাহাবী স্বীয় সনদে ইবরাহীম নাখায়ী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর রা. এর আমলে জানাযার তাকবীর সংখ্যা নিয়ে সাহাবীগনের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিলে উমর রা. সকলকে একত্রিত করে বললেন,

انكم معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكانما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله عنه بل أشيروا انتم على فانما انا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر اربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك .

(الطحاوي – باب التكبير على الجنائز كم هو) صـــ ١/٣١٩

অর্থাৎ আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আপনাদের দ্বিমত পরবর্তীদের উপর প্রভাব ফেলবে। আর আপনাদের ঐকমত্যের ফলে অন্যরাও একমত থাকবে। সুতরাং ভেবে চিন্তে আপনারা একটি বিষয়ে একমত হন। এ কথায় তিনি যেন তাঁদের জাগিয়ে তুললেন। তারা বললেন, হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন। তবে এ বিষয়ে আপনি আপনার মতামত বলুন। তিনি বললেন, আপনারাই বরং আমাকে পরামর্শ দিন। কারণ, আমি তো আপনাদের মতোই একজন মানুষ। পরে তাঁরা মত বিনিময় করে এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌছলেন যে, যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় চার তাকবীর হয়ে থাকে, তেমনি জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে। (তাহাবী শরীফ, ১খ, ৩১৯পৃ)

এ বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, ঈদের নামাযে চার তাকবীর হওয়ার বিষয়টি ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

তাবেয়ীগণের আমল:

১. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব র. যিনি মদীনা শরীফে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন এবং আবূ হুরায়রা রা. এর জামাতা ছিলেন, তার ফতোয়া ৮নং দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মাসরূক র. এর ফতোয়া :

عن الشعبي قال أرسل زياد إلى مسروق انا تشغلنا أشغال فكيف التكبير في العيدين

قال تسع تكبيرات قال خمسا في الاولى واربعا في الآخرة ويوالي بين القراءتين .

أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه وهذا إسناد صحيح (٥٧٥٨)

وأخرجه عبد الرزاق نحوه عن معمر عن قتادة (٥٦٨٨) وهذا إسناد حسن.

অর্থ : শা'বী র. বলেন, যিয়াদ লোক পাঠিয়ে মাসরূক র. এর নিকট জানতে চাইল। আমরা তো খুব কর্মব্যস্ত। ঈদের তাকবীর কিভাবে দিতে হবে? তিনি বললেন, নয়টি তাকবীর বলতে হবে। ৫টি প্রথম রাকাতে , চারটি ২য় রাকাতে। আর কেরাত পড়বে উভয় রাকাতে একটানা। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৮; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৮৮। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. ও মাসরূক র. এর আমল:

عن إبراهيم عن الأسود ومسروق انهما كانا يكبران في العيد تسع تكبيرات .

أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٥٩) عن غندر وابن مهدي عن شعبة عن منصور عنه

অর্থ: ইবরাহীম নাখায়ী র. থেকে বর্ণিত, তিনি আসওয়াদ র. ও মাসরূক র. সম্পর্কে বলেছেন, তারা দুজনই ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৯। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৪. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. ও হাসান বসরী র. এর আমল:

عن هشام عن الحسن ومحمد انهما كانا يكبران تسع تكبيرات. أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٦٥) عن إسحاق الأزرق عنه.

অর্থ: হিশাম র. বলেন, হাসান বসরী র. ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. নয় তাকবীর বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬৫। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৫. শা'বী র. ও মুসায়্যাব ইবনে রাফে' র. এর ফতোয়া:

عن الشعبي والمسيب قالا الصلاة يوم العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولى واربع في الآخرة ليس بين القراءتين تكبيرة . أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٧٤) عن إسحاق بن منصور عن أبي كدينة عن الشيباني عنهما.

অর্থ: শা'বী ও মুসায়্যাব র. বলেন, উভয় ঈদের নামাযে তাকবীর হবে নয়টি। প্রথম রাকাতে ৫টি ও ২য় রাকাতে চারটি । উভয় রাকাতের কেরাতের মাঝে তাকবীর হবেনা। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৭৪।

৬. আবূ কিলাবা র. এর ফতোয়া:

أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال التكبير في العيدين تسع. (٥٧٦٢)

অর্থ: আবূ কিলাবা র. বলেন, দুই ঈদে তাকবীর হবে নয়টি করে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬২। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৭. ইমাম বাকের র. এর ফতোয়া:

عن أبي جعفر انه كان يفتي بقول عبد الله في التكبير في العيدين. أخرجه ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عنه.(٥٧٦٣)

^ List

অর্থ: জাফর সাদেক র.এর আব্বা (ইমাম বাকের র.) উভয় ঈদের তাকবীর **সম্পর্কে** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। **মুসান্নাফে ইবনে** আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬৩। এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

৮. হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণের আমল:

عن إبراهيم ان اصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد تسع تكبيرات . أخرجه ابن أبي شيبة عن إسحاق الأزرق عن الأعمش عنه. (٥٧٦١) وإسناده صحيح.

অর্থ: ইবরাহীম নাখায়ী র. বলেন, ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ দুই ঈদে **নয়টি** তাকবীর বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬১। এই **হাদীসের** সনদ সহীহ।

১২ তাকবীরের হাদীসগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা

১. কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস: তিনি তার পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী র. ও তিরমিযী র. এর মতে বার তাকবীরের হাদীসগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে ভাল। তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু কাছীর সম্পর্কে আবূ দাউদ র. বলেছেন, كان أحد الكذابين (সে ছিল একজন মিথ্যুক)। ইমাম শাফেয়ী র. বলেছেন, এ ব্যক্তি চরম মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম আহমদ, ইবনে মাঈন, আবূ যুরআ, আবূ হাতেম, নাসায়ী, দারাকুতনী, ইবনে সা'দ, ইবনে হিব্বান, ইবনুস সাকান, হাকেম ও ইবনে হাযম সকলে তাকে যঈফ (দুর্বল) অথবা মাতরূক (পরিত্যাগযোগ্য) আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, তার যঈফ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। মিযযী, যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালানীও তাকে যঈফ বলেছেন। লা-মাযহাবী আলেম তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার মোবারকপুরী ও আলবানী (ইবনে খুযায়মার টীকায়) সাহেবরাও এটি যঈফ বলেছেন।

২.আয়েশা রা. এর হাদীসটি আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদে ইবনে লাহীআ আছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। (দ্র, ইলালে তিরমিযী আল কাবীর, পৃ, ৯৪) হাকেম আবূ আব্দুল্লাহও এটিকে যঈফ বলেছেন। দারাকুতনী ও তাহাবী র. একই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইবনে হাজার আসকালানী তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে বলেছেন, ইবনে লাহীআ থেকে এর সনদে এজতেরাব ও এখতেলাফ রয়েছে। তদুপরি ইবনে লাহীআ যঈফ ।

৩. ইবনে উমর রা. এর হাদীসটি দারাকুতনী, তাহাবী ও বাযযারে আছে। এর সনদে ফারাজ ইবনে ফাদালা (فرج بن فضالة) আছেন। তিনি যঈফ। তার এ

হাদীসকে বুখারী, আবূ হাতেম রাযী ও তিরমিযী প্রমুখ ভুল বর্ণনা আখ্যা দিয়েছেন। ফারাজের উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আমের আসলামীও দুর্বল। আহমাদ, ইবনে মাঈন, ইবনুল মাদীনী, আবূ যুরআ, আবূ হাতেম, বুখারী , আবু দাউদ ও দারাকুতনী র. তাকে যঈফ ও দুর্বল বলেছেন।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তাইফী আছেন। ইবনে মাঈন, আবূ হাতেম, নাসায়ী, দারাকুতনী, উকায়লী, ইবনুল জাওযী ও ইবনুল কাত্তান র. প্রমুখ তাকে যঈফ বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাকেম এই হাদীসের সনদকে ফাসেদ বা খারাপ বলেছেন। ইবনে হাজার অবশ্য 'তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসকে আহমাদ, ইবনুল মাদীনী ও তিরমিযীর বর্ণনা অনুসারে বুখারী র. সহীহ বলেছেন। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয় । কারণ উকায়লী র. ইমাম আহমাদ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح (উভয় ঈদের তাকবীর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই)। সুতরাং এই হাদীসকে তিনি সহীহ বলেতে পারেননা। বুখারী র. এর কথা যদিও তিরমিযী র. উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই 'সহীহ' শাব্দিক অর্থে হবে। অর্থাৎ হাদীসটি ঠিক আছে; পারিভাষিক অর্থে নয়। কারণ বুখারী ও তিরমিযী দুজনের মতেই বার তাকবীর সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো হাদীস হল পূর্বে উল্লিখিত প্রথম হাদীসটি। আর সেটাকে তিরমিযী সহীহ বলেননি, হাসান বলেছেন। যা সহীহ থেকে নীচের স্তরের। আর অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতানুসারে সেটিও চরম দুর্বল। সুতরাং সেই হাদীসের চেয়ে নিম্নস্তরের হাদীস পারিভাষিক অর্থে সহীহ হতে পারেনা। এই কারণে মুনযিরী র. মুখতাসার আবূ দাউদে বলেছেন, وفي إسناده عبد الله الطائفي وفيه مقال

অর্থাৎ এর সনদে আব্দুল্লাহ তাইফী আছেন, যার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

তাহাবী র. বলেছেন, والطائفي ليس عندهم بالذي يحتج بروايته

অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তাইফীর বর্ণনা প্রমাণযোগ্য নয়। তাছাড়া বুখারী র. তার সম্পর্কে বলেছেন, فيه نظر (তার ব্যাপারে আপত্তি আছে)। (দ্র, তাহযীবুত তাহযীব)

৫. হযরত আলী রা. এর হাদীসটির সূত্র বিচ্ছিন্ন। তদুপরি এর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে আবী ইয়াহয়া চরম দুর্বল।

৬. হযরত জাবের রা. এর একটি হাদীস বায়হাকীতে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদে আলী ইবনে আসেম আছেন। শো'বা র., ইবনুল মুবারক র., ইবনুল মাদীনী, ইবনে

মাঈন, নাসায়ী, সাজী ও সালেহ জাযারা প্রমুখ তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. বলেছেন, ما زلنا نعرفه بالكذب

অর্থাৎ আমরা সর্বদা তাকে মিথ্যুক বলেই জানি। এর বিপরীত জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে আমরা ছয় তাকবীরের হাদীস উল্লেখ করেছি। সেটিও আলী ইবনে আসেমের ভ্রান্তির দলীল বৈ কি?

৭. আব্দুর রহমান ইবনে আওফের একটি হাদীস বাযযারে আছে। এর সনদে হাসান ইবনে হাম্মাদ বাজালী আছেন। তাকে বাযযার র.(দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদের টীকা) ও শাওকানী (তিনি লা-মাযহাবী আলেম) বলেছেন لين الحديث (অর্থাৎ তার হাদীস দুর্বল)। দারাকুতনীর মতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসরূপে এটা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন, এটি মাওকূফ (সাহাবীর বক্তব্য বা কর্ম) হওয়াই সঠিক।

৮. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি হাদীস তাবারানীর- আলমুজামুল কাবীরে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে সুলায়মান ইবনে আরকাম আছেন, যিনি সকল মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে পরিত্যাগযোগ্য। এর আরেকটি সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আযীয তদীয় পিতা আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আযীয সম্পর্কে বুখারী র. বলেছেন, منكر الحديث (তার হাদীস আপত্তিকর)। নাসায়ী র. বলেছেন, متروك الحديث (তার হাদীস বর্জনযোগ্য)। আর আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, ضعيف الحديث

(তার হাদীস দুর্বল)। অধিকন্তু তার পিতা আব্দুল আযীয সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান র. বলেছেন, তার অবস্থা অজানা।

৯. আবূ ওয়াকিদ লায়ছী রা. এর হাদীস তাহাবী ও তাবারানী উদ্ধৃত করেছেন। এটি সম্পর্কে আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, هذا حديث باطل بهذا الإسناد

অর্থাৎ এইসূত্রে হাদীসটি বাতিল। (দ্র, আত তালখীসুলহাবীর)

পরিশেষে লা-মাযহাবী বন্ধুদেরকে একটি কথা বলতে চাই। মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা ভাল কাজ নয়। বিরোধপূর্ণ মাসআলায় সালাফ ও পূর্বসূরিগণের পথ অনুসরণ করাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমাদের পূর্বসূরিগণ দ্বিমত করেছেন কিন্তু কাদা ছোড়াছুড়ি করেননি। ইমাম আহমাদ র. বার তাকবীরকে পছন্দ করতেন। কিন্তু সাথে তিনি একথাও বলেছেন,

وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز

অর্থাৎ ঈদের তাকবীর নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে দ্বিমত ছিল। সব পন্থাই জায়েয।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলীর. তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইমাম আহমাদের এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন,

وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة ، وإن كانَ الافضل عنده سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية .ورجح هذا ابن عبد البر ، وجعله من الاختلاف المباح ، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها .(فتح الباري ٥/٢١٤)

অর্থাৎ এটা তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, ঈদের তাকবীর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসব বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, এর সবই জায়েয, কোনটিই মাকরূহ নয়। যদিও তার মতে উত্তম হলো, প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর। ইবনে আব্দুল বার র.ও সকল পদ্ধতি জায়েয হওয়ার এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বিমতকে বৈধ মতানৈক্য আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, আযান ও তাশাহহুদ ইত্যাদির একাধিক পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিমত । (দ্র, ফাতহুল বারী, ৫খ, ২১৪পৃ; আলইসতিযকার,২খ, ৩৯৭ পৃ)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া র. লিখেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের নীতি - আর এটাই বিশুদ্ধ নীতি – এই যে, ইবাদতের পদ্ধতি বিষয়ে যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে তা মাকরূহ হবে না। বরং তা হবে শরীয়তসম্মত। সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম, তারজী' যুক্ত ও তারজী' বিহীন, ইকামতের দুই নিয়ম, বাক্যগুলো দুবার করে বলা বা একবার করে, তাশাহহুদ, ছানা, আউযু এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কেরাত, এসবই উক্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা, জানাযা নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার একাধিক নিয়ম, কুনুত পাঠ- রুকুর আগে বা পরে, রাব্বানা.লাকাল হামদ 'ওয়া'সহ বা 'ওয়া' ছাড়া এসবই শরীয়তসম্মত। কোন পদ্ধতি কখনো উত্তম হতে পারে। কিন্তু অন্যটি মাকরূহ কখনো নয়। (দ্র, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৪খ, ২৪২-২৪৩পৃ)

ইবনে রুশদ মালেকী র. তার বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে বলেছেন, ঈদের তাকবীর সংখ্যার ব্যাপারে কোন সহীহ মারফূ হাদীস প্রমাণিত নেই। এরপর তিনি ইমাম আহমাদের এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, দুই ঈদের তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই। এরপর ইবনে রুশদ বলেন, একারণে ফকীহগণ বিভিন্ন সাহাবীর আমলকে দলিল বানিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে দ্বিমত হচ্ছে কোন পদ্ধতি উত্তম তা নিয়ে। অন্যথায় যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক, সকলের নিকট তা জায়েয।

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত হচ্ছে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নত নয়। বরং প্রথম তাকবীর বলে সানা পড়বে, দ্বিতীয় তাকবীর বলে দুরূদ শরীফ পড়বে, তৃতীয় তাকবীর বলে দুআ পড়বে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। হ্যাঁ, সানা হিসেবে (অর্থাৎ সানার পরিবর্তে) সূরা ফাতেহা ও পড়তে পারে, কেরাত হিসেবে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আমল দ্বারাই একথা প্রমাণিত।

এমতের পক্ষে দলিলগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ »

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে, তখন তার জন্যে একনিষ্ঠভাবে দুআ কর। (আবূ দাউদ শরীফ, ২খ, ৪৫৬পৃ)

২. নাফে র. থেকে বর্ণিত,

أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. জানাযার নামাযে কেরাত পড়তেননা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২২)

৩. হযরত আবু সাঈদ রা. বলেন,

أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنائز فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها مع أهلها فإذا وضعوها كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم أقول

তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কিভাবে জানাযার নামায পড়েন? হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর কসম , আমি তোমাকে

অবশ্যই তা জানাব। মৃতব্যক্তির পরিবারের সাথে আমি যাই। যখন (নামাযের জন্যে) তারা তার লাশ রাখে, তখন আমি তাকবীর বলি ও আল্লাহর হামদ পাঠ করি, তার নবীর উপর দরূদ পড়ি অতঃপর (নিম্নোক্ত দুআটি) পড়ি ....

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ الا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ، اَللّٰهُمَّ انْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اَللّٰهُمَّ لا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক,হাদীস নং৬৪২৫)

৪. আবুল মিনহাল র.বলেন,

سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجود .

আমি আবুল আলিয়াকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি মনে করি, সূরা ফাতেহা শুধু সে নামাযেই পড়া যাবে যেখানে রুকু ও সিজদা রয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং১১৫২৪)

৫. আবু বুরদা র. থেকে বর্ণিত,

قال له رجل أقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال لا تقرأ .

এক লোক তাকে বলল, আমি জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ি। তিনি তাকে বললেন, তুমি (তা) পড়োনা। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৬।

৬. হাজ্জাজ র. বলেন,

سألت عطاء عن القراءة على الجنازة فقال ما سمعنا هذا إلا حديثا.

আমি আতাকে জানাযার নামাযের কেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা একটি হাদীস ছাড়া এমন কিছু শুনিনি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৭)

৭. শাবী র.বলেন,

ليس في الجنازة قراءة .

জানাযার নামাযে কোন কেরাত নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং১১৫২৮)

৮. ইবনে তাউস তার পিতা ও আতা থেকে বর্ণনা করেন,

أنهما كانا ينكران القراءة على الجنازة .

তারা দুজন জানাযার নামাযে কেরাত অপছন্দ করতেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৯)

৯. বাক্‌র ইবনে আব্দুল্লাহ র. বলেন,

لا أعلم فيها قراءة .

জানাযার নামাযে কোন কেরাত আছে বলে আমি জানিনা।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫৩০)

১০. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,

سألت سالما فقلت القراءة على الجنازة فقال لا قراءة على الجنازة .

আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম: জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা (পড়তে হবে)? তিনি বললেন, জানাযায় কোন কেরাত নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫৩২)

১১. ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত,

كان لا يقرا في شيء من التكبيرات وكان يقول .

তিনি জানাযার তাকবীরগুলোতে কোন কেরাত পড়তেননা। বরং পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاجْعَلْ قُلُوْبَهُمْ عَلَى قُلُوْبِ اَخْيَارِهِمْ، اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمُهْتَدِيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ تَرِكَتِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، اَللّٰهُمَّ لا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক,হাদীস নং৬৪৩২)

১২. আইয়ুব র. থেকে বর্ণিত,

عن محمد أنه كان لا يقرأ على الميت .

মুহাম্মদ (ইবনে সীরীন) রহ. মৃতের জন্যে (জানাযার নামাযে) কেরাত পড়তেননা। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৩|

১৩. হাম্মাদ র. বলেন,

عن إبراهيم قال سألته أيقرا على الميت إذا صلى عليه قال لا

আমি ইবরাহীম রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন মৃতব্যক্তির জন্যে জানাাযার নামায পড়া হয় তখন কি কোন কেরাত পড়া হবে? তিনি বললেন, না। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং৬৪৩৩)

১৪. হযরত শাবী বলেন,

التكبيرة الاولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم

জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর আল্লাহর প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়া, তৃতীয় তাকবীর মৃতের জন্যে দুআ করা এবং চতুর্থ তাকবীর হচ্ছে সালাম ফিরানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক,হাদীস নং ৬৪৩৪)

১৫. হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত ,

أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে (জানাযার নামাযে) কোন কথা বা দুআ নির্দিষ্ট করেননি। (মুগনী)

১৬. মানসূর বলেন,

قلت لإبراهيم على الميت شيء موقت قال لا أعلمه

আমি ইবরাহীম রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, জানাযার নামাযে নির্দিষ্ট কিছু পড়তে হবে? তিনি বললেন, আমার জানা নেই।(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৬৪৩৫)

১৭. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব র. বলেন,

ما نعلم في الصلاة على الميت من قراءة ولا دعاء شيئا معلوما

জানাযার নামাযে নির্দিষ্ট কোন কেরাত ও দুআ আছে বলে আমার জানা নেই।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক,হাদীস নং ৬৪৩৬)

ফিকহে মালেকীর প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা-য় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের উপরোক্ত আমলের কথাই বর্ণিত হয়েছেঃ

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد: أنهم لم يكونوا يقرءون في الصلاة على الميت. قال ابن وهب وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك.

অর্থঃ ইবনে ওয়াহব র. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ফাযালা ইবনে ওবায়দ, আবু হুরায়রা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী ও কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনুল মুসায়্যাব, রবীয়া, আতা ইবনে আবী রাবাহ ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. প্রমুখ তাবেয়ী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তাঁরা জানাযার নামাযে কেরাত পড়তেন না। ইবনে ওয়াহব বলেন, মালেক র. বলেছেন, আমাদের শহরে (অর্থাৎ মদীনায়) এর উপর (অর্থাৎ জানাযার নামাযে কেরাত পড়ার উপর) আমল করা হয়না। জানাযা তো দোয়ারই নাম। আমি আমাদের শহরের অধিবাসীদেরকে এর উপরই পেয়েছি। (দ্র, খঃ ১ পৃঃ২৬৭)

কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, সাহাবী ও তাবেয়ীদের কেউ কেউ জানাযার নামাযের প্রত্যেক তাকবীরের পরই সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং দুআ করতেন। এথেকেও বুঝা যায়, তারা সূরা ফাতেহা কেরাত হিসেবে নয়, বরং হামদ হিসেবেই পড়েছেন। যেমনঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের বর্ণনা -

عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأنس بن مالك وبن عباس أنهم كانوا يقرؤون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث ثم يكبرون الرابعة فينصرفون ولا يقرؤون.

হযরত আবু হুরায়রা , আবুদ্দারদা, আনাস ইবনে মালিক ও ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তারা প্রথম তিন তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়তেন, দুআ করতেন ও ইসতিগফার করতেন। এরপর চতুর্থ তাকবীর বলতেন। এবং কোন কেরাত না পড়েই নামায শেষ করতেন।(হাদীস নং ৬৪৩৭)

وعن الحسن كان يقرأ في التكبيرات كلها بأم القرآن

হযরত হাসান (বসরী) র. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক তাকবীরের পরই সূরা ফাতেহা পড়তেন। (হাদীস নং ৬৪৩০)

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে,

إنه من السنة أو من تمام السنة

অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত অথবা সুন্নতের পরিপূর্ণতা। এটি যদিও বাহ্যত আমাদের হানাফী মাযহাবের বিপরীত মনে হয়, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত হাদীসগুলোর সাথে মিলালে দেখা যাবে, ইবনে আব্বাস রা.ও তা কেরাত হিসেবে নয়, বরং হামদ ও দোয়া হিসেবেই পড়তেন।

তারাবী বিশ রাকাত পড়া সুন্নত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তারাবী পড়েছেন। কত রাকাত পড়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে হযরত উমর রা. এর খেলাফতের দ্বিতীয় বছর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ রাকাত তারাবী পড়া হয়ে আসছে। এ দীর্ঘ সময় কোথাও আট রাকাত পড়ার প্রচলন ছিলনা।

আমরা যাদেরকে লা-মাযহাবী বলি এরা ইংরেজ আমলে সৃষ্ট। প্রথম প্রথম এদের অনেকেই বিশ রাকাত তারাবী পড় গেছেন। সর্বপ্রথম ১২৮৪ হিজরী সালে ভারতের আকবরাবাদ থেকে এদের একজন আট রাকাত তারাবীর ফতোয়া দেন। তীব্র প্রতিবাদের মুখে সেই ফতোয়া টিকতে পারেনি। এরপর ১২৮৫ হিজরীতে পাঞ্জাব সীমান্তে মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী নামে এদের আরেক জন ফতোয়া দেন যে, আট রাকাত তারাবী পড়া সুন্নত। বিশ রাকাত পড়া বেদাত। তার ফতোয়ারও তীব্র বিরোধিতা হয়। এমনকি তাদেরই একজন বিখ্যাত আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল ঐ ফতোয়ার খন্ডনে 'রিসালা তারাবী' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ১২৯০ সালে সেটি প্রকাশিত হয়। (দ্র.রাসায়েলে আহলে হাদীস, ২খ, ২৮ পৃ)। কিন্তু এতেও আটের ফতোয়া বন্ধ হয়নি। পরবর্তীতে হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী সহ এদের আরো কিছু আলেম জোড়ালোভাবে ঐ ফতোয়া প্রচার করতে থাকেন। আলেমদের পক্ষ থেকে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. মাওলানা কাসেম নানুতুবী র. ও পরবর্তীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী র. প্রমুখ স্বতন্ত্র পুস্তিকা লেখে তাদের ফতোয়া খন্ডন করেন।

ভারতবর্ষের পরে আরবেও দু'একজন আটের ফতোয়া দিতে শুরু করেন। হারামাইন শরীফাইন তথা বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবী অব্যাহত থাকলেও সর্বপ্রথম সেখানে শায়খ নসীব রেফায়ী একটি পুস্তিকা লিখে আট রাকাতের ফতোয়াকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানীও তার সমর্থন করেন। এর খন্ডনে আরব জাহানের কয়েকজন আলেম কলম ধরেন। একাধিক আলেমের রচনার সমষ্টি الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين والصحابة নামে প্রকাশিত হয়। সেখানে তাঁরা লিখেছেন,

ولم يشذ أحد منهم بمنعها غير هذه الشرذمة القليلة التي ظهرت في زماننا كالشيخ ناصر وإخوانه

অর্থাৎ আমাদের যুগে আত্মপ্রকাশকারী নাসিরুদ্দীন আলবানী ও তার সমর্থকদের ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া কেউই অনুরূপ ফতোয়া দিয়ে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেননি। (দ্র, পৃ, ৬১)

এ পুস্তিকাটির খন্ডনে আলবানী সাহেব 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে ১৩৭৭ হি. সালে প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে আলবানী সাহেবের উসূলে হাদীস (হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি), উসূলে ফিক্হ (ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি), রিজাল শাস্ত্র (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীমূলক গ্রন্থ) ও জারাহ-তাদীল (বর্ণনাকারীদের সমালোচনা) সম্পর্কিত মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও দৈন্যতা সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। তদুপরি তিনি সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের কোন একজনকেও দেখাতে পারেননি, যিনি আট রাকাত তারাবীর কথা বলেছেন। এমনিভাবে এমন কোন ঐতিহাসিক মসজিদের নজিরও দেখাতে পারেননি যেখানে আট রাকাত তারাবী হতো।

এতদ্সত্তেও আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা আলবানী সাহেবের গবেষণাকেই চূড়ান্ত জ্ঞান করে তারই অন্ধ অনুসরণ শুরু করেছে। অধিকন্তু আলবানী সাহেব যা করতে পারেননি অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের নাম বিকৃত করা, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীকে অবিশ্বস্ত আখ্যা দেওয়া, ভুল উদ্ধৃতি দেওয়া ও কোন গ্রন্থের নাম ভুল উচ্চারণ করা ইত্যাদি কাজেরও লজ্জাস্কর নজির স্থাপন করেছেন তাদেরই অনূদিত বুখারী শরীফের টীকায়। কবিগুরু সুন্দর বলেছেন, বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।

আলবানী সাহেবের পুস্তিকাটির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদ্দিস শায়খ ইসমাঈল আনসারী। তার কিতাবটির নাম- 'তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবী ইশরীনা রাকআতান ওয়ার রাদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী'। একইভাবে সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম, মসজিদে নববীর প্রসিদ্ধ মুদাররিস ও মদীনা শরীফের সাবেক কাযী শায়খ আতিয়্যা সালিম 'আততারাবীহ আকছারু মিন আলফি আম' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সৌদির আরেকজন খ্যাতনামা আলেম, বহুগ্রন্থ প্রনেতা শায়খ মুহাম্মদ আলী সাবূনী সাহেবও এ বিষয়ে 'আততারাবী ইশরূনা রাকআতান' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। আর লা-মাযহাবী

আলেম মোবারকপুরী সাহেবের খন্ডনে কলম ধরেছেন বিগত শতকের সেরা মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী র. - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, মুসনাদে হুমায়দী সহ বহু হাদীসগ্রন্থ সম্পাদনাপূর্বক যিনি পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন এবং আরব বিশ্বের বড় বড় আলেম শায়খ মুসতাফা যারকা, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ, নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ যার কাছ থেকে হাদীসের ইজাযত হাসিল করেছেন। 'রাকআতে তারাবী' নামে উর্দূ ভাষায় তিনি অত্যন্ত সারগর্ভ ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সর্বপ্রথম ১৩৭৬ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের ঐসব বন্ধুরা উল্লিখিত গ্রন্থগুলো পড়ে দেখার প্রয়োজনও মনে করেননা।

যাহোক , ভূমিকা-স্বরূপ লেখা এ কথাগুলো দীর্ঘ হয়ে গেল। এখন আমি বিশ রাকাত তারাবীর প্রমাণগুলো উপস্থাপন করবো। এবং সবশেষে আট রাকাতের প্রমাণগুলো সম্পর্কেও কিছু পর্যালোচনা পেশ করবো। আমার নিজস্ব রুচি ভিন্ন থাকলেও এখানে তাদের অনুদিত বুখারী শরীফের টীকার ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করে আলোচনার প্রয়াস পাব।

১নং দলিল: ইবনে আবী শায়বা র. বলেন,

حدثنا يزيد بن هارون قال انا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر .

অর্থ: আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইবনে হারূন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইবনে উসমান জানিয়েছেন হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাত তারাবী ও বিতর পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৭৪; তাবারানী , আল কাবীর, হাদীস নং ১২১০২; আল আওসাত, হাদীস নং ৭৯৮; বায়হাকী, ১/৪৯৬।

এ হাদীসটির সনদে আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান আছেন, তিনি যয়ীফ বা দূর্বল। এ কারণে বায়হাকী র.সহ অনেকেই এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। কিন্তু আলবানী সাহেব ও তার অনুসারী লা-মাযহাবী বন্ধুরা এটিকে 'মাওযূ' বা

জাল আখ্যা দিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিসই এটিকে জাল আখ্যায়িত করেননি। জাল ও যয়ীফের মাঝে দুস্তর ব্যবধান। জাল হাদীস তো হাদীসই নয়। আর যয়ীফ হাদীসকে প্রায় সকল মুহাদ্দিসই শর্ত সাপেক্ষে ফযিলতের ক্ষেত্রে, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ও রিকাক বা চিত্তবিগলনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। আর আহকাম বা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফকে দুভাগে ভাগ করেছেন। এক. এমন যয়ীফ হাদীস, যার সমর্থনে কোন শরয়ী দলিল নেই, বরং এর বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। এ ধরণের যয়ীফ আমলযোগ্য নয়। দুই. সনদের বিবেচনায় হাদীসটি যয়ীফ বটে, তবে এর সমর্থনে শরয়ী দলিল প্রমাণ আছে, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকে এ হাদীস অনুসারে আমল চলে আসছে। এমন যয়ীফ হাদীস শুধু আমলযোগ্যই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মুতাওয়াতির বা অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মানোত্তীর্ণ। 'আল আজবিবাতুল ফাযিলা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ র. এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম র. তার 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে একটি যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به

অর্থাৎ এ হাদীসটি প্রমাণিত না হলেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শহরে কোন রূপ আপত্তি ছাড়া এ অনুযায়ী আমল চালু থাকাই হাদীসটি আমলযোগ্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। (দ্র, পৃ,১৬)

ইমাম যারকাশী র. তাঁর হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'আননুকাত' এ বলেছেন,

إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى ينزل منزلة المتواتر

অর্থাৎ যয়ীফ হাদীসকে যখন উম্মাহ ব্যাপকভাবে গ্রহন করে নেয়, তখন সঠিক মতানুসারে সেই হাদীসটি আমলযোগ্য হয়, এমনকি তা মুতাওয়াতির হাদীসের মানে পৌঁছে যায়। (দ্র, ১খ, ৩৯০ পৃ)

হাফেজ শামসুদ্দীন আসসাখাবী র.ও তাঁর 'ফাতহুল মুগীছ' গ্রন্থে লিখেছেন,

وكذا إذا تلقت الأمه الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه يتزل متزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصية لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية.

অর্থাৎ উম্মাহ যখন যয়ীফ হাদীসকে ব্যাপকহারে গ্রহন করে নেয়, তখন সহীহ মত অনুসারে সেটি আমলযোগ্য হয়, এমনকি তার দ্বারা অকাট্য বিধান রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি মুতাওয়াতির দলিলের মানোত্তীর্ণ হয়। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী র. 'উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন ওসিয়ত নেই' হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, হাদীস বিশারদগণ এটিকে সুপ্রমাণিত মনে না করলেও ব্যাপকহারে আলেমগণ এটি গ্রহণ করে নিয়েছেন, এ অনুযায়ী আমল করেছেন, এমনকি তারা এটিকে ওসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতটির বিধান রহিতকারী আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র,১খ, ৩৩৩পৃ)

আমাদের আলোচ্য হাদীসটি এই দ্বিতীয় প্রকার যয়ীফের অন্তর্ভূক্ত। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাহর ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন আমল এ অনুযায়ী চলে আসছে। সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে এটি অবশ্যই আমলযোগ্য বলে গণ্য হবে। এটিকে জাল আখ্যায়িত করা হাদীস শাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতি উপেক্ষা করারই নামান্তর।[১]

---

১. আলবানী সাহেব তিনটি কারণে এই হাদীসকে জাল আখ্যায়িত করেছেন। এক, এটি হযরত আয়েশা রা. ও হযরত জাবের রা. বর্ণিত হাদীসের বিপরীত।

এর জবাবে আমরা বলবো, হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, আর এটি তারাবী সম্পর্কে। সুতরাং দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই । তাছাড়া হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসে এগারো রাকাতের উল্লেখ এসেছে। তার আরেকটি বর্ণনায় তেরো রাকাতের উল্লেখ এসেছে। এই দুটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে আলেমগণ বলেছেন, এগারো রাকাত সাধারণ আমল ছিল। আর তের রাকাত মাঝে মধ্যে পড়তেন। একইভাবে বলা চলে, বিশ রাকাতও মাঝে-মধ্যে পড়া হয়েছিল। তের রাকাত যেমন এগারো রাকাতের বিপরীত নয়, তেমনি বিশ রাকাতও এগারো রাকাতের বিপরীত হবেনা। আর হযরত জাবের রা. বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ। সুতরাং তার বিপরীত হওয়াতে কিছু আসে যায়না । এ সম্পর্কে আলোচনা শেষ দিকে আসছে।

দুই, আবু শায়বাকে হযরত শো'বা র. মিথ্যুক বলেছেন। আর বুখারী র. তার সম্পর্কে বলেছেন, سكتوا عنه- তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ তাঁরা তাকে বর্জন করেছেন। আর এটা বুখারী র. এর কড়া সমালোচনামূলক শব্দ। উল্লেখ্য, লা-মাযহাবী বন্ধুরা ইমাম বুখারী র. এর কথাটির অনুবাদ করেছেন, 'তার ব্যাপারে কেউ মত ব্যক্ত করেনি'। এটা ভুল অনুবাদ।

এই দ্বিতীয় কারণটির জবাবে আমরা বলবো, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে একমাত্র শো'বা র.ই তাকে মিথ্যুক বলেছেন, এর কারণও তিনি এই বলে উল্লেখ করেছেন, আবূ শায়বা তার উস্তাদ হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, সিফফীন যুদ্ধে সত্তর জন বদরী সাহাবী শরিক ছিলেন। শো'বা বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাকামের সঙ্গে আলোচনা করে শুধু একজন বদরী সাহাবী পেয়েছি। তিনি হলেন হযরত খুযায়মা রা.।

যাহাবী র. 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে শো'বার কথাটি এই বলে খন্ডন করেছেন,

سبحان الله أما شهدها علي أما شهدها عمار

অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্য! সিফফীনে কি হযরত আলী রা. শরিক ছিলেননা? হযরত আম্মার রা. শরিক ছিলেননা? (দ্র, ১খ, ৪৭পৃ)

অর্থাৎ হযরত আলী রা. ও হযরত আম্মার রা. তো বদরী ছিলেন, তারাও তো সিফফীনে শরিক ছিলেন। তাহলে তো এখানেই তিনজন হয়ে গেল। খুঁজলে হয়তো এভাবে আরো অনেকের নাম বের হয়ে আসবে। তাহলে শো'বা র. এর কথা ঠিক হলো কি করে?

তাছাড়া শো'বা র. বলেছেন, *কাযাবা* যার একটি অর্থ হলো, মিথ্যা বলেছে। এ অর্থ ধরেই বলা হয়, শো'বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন। অথচ এ শব্দটির এ অর্থও হতে পারে- ভুল বলেছে। এ অর্থে *কাযাবা* শব্দটির ব্যবহারের বহু নজির তুলে ধরা হয়েছে 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস' গ্রন্থে। এ অর্থটি গ্রহণ করলে 'শো'বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন' সেটা প্রমাণিত হয়না।

আর ইমাম বুখারী র. এর মন্তব্য সম্পর্কে বলবো, এমন একাধিক নজির রয়েছে, যেখানে বুখারী র. ঐ মন্তব্য করা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির হাদীস গ্রহন করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ আবূ কাতাদার জীবনী দেখুন। বুখারী র. তার ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে আদী র. তার 'আল কামিল' গ্রন্থে তার সঙ্গে একমত হন নি। মুকাতিল ইবনে সুলায়মানের জীবনী দেখুন। বুখারী র. উক্ত মন্তব্য করা সত্ত্বেও ইবনে আদী র. বলেছেন, له أحاديث صالحة তাঁর কিছু ভাল হাদীসও রয়েছে। আমাদের আলোচ্য আবূ শায়বা সম্পর্কেও ইবনে আদী র. লিখেছেন,

له أحاديث صالحة وهو خير من إبراهيم بن أبي حية

অর্থাৎ তার কিছু ভাল হাদীসও রয়েছে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবূ হাইয়্যার চেয়ে ভাল। (দ্র, তাহযযীব, ১খ, ১৪৫পৃ)

মোট কথা, আলবানী সাহেব আবূ শায়বা সম্পর্কে পূর্ণ ইনসাফ অবলম্বন করেননি। অন্যথায় ইবনে আদীর উপরোক্ত মন্তব্যও উল্লেখ করতেন। উল্লেখ করতেন ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. এর মন্তব্যও । ইয়াযীদ ইবনে হারূন ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও খ্যাতনামা হাফেজে হাদীস, তিনি বুখারী র. এর উস্তাদের উস্তাদও ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন,

ما قضى على الناس رجل يعني في زمانه أعدل في قضاء منه

অর্থাৎ আমাদের যুগে তাঁর চেয়ে বড় ন্যায়পরায়ন কাজি (বিচারক) কেউ হন নি। উল্লেখ্য, আবূ শায়বা যখন ওয়াসিতের কাজি ছিলেন, তখন ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। সুতরাং তাকে কাছ থেকে যাচাই করার যেমন সুযোগ তার হয়েছিল তেমনটি অন্য কারো হয়নি। সুতরাং তার উক্ত মন্তব্য আবূ শায়বার ইলম ও ন্যায়পরায়নতার ব্যাপারে উজ্জল সাক্ষী। কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে দুটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যনীয়। এক, তার দীনদারী ও ন্যায়পরায়নতা; দুই, তার মেধা ও স্মৃতিশক্তি। ইয়াযীদ র. এর সাক্ষ্যপ্রমাণে তার ন্যায়পরায়নতার বিষয়টি সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। (প, পৃ, দ্র,)

২নং দলিল: ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা র. বর্ণনা করেন:

عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة

....

আর ইবনে আদীর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, তার মেধাও এত খারাপ ছিলনা। তার কিছু ভাল হাদীসও পাওয়া গেছে। স্মর্তব্য, আলোচ্য হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. নিজেই আবূ শায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য আবূ শায়বাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়া নয়। বরং আলবানী সাহেব যে তার প্রতি পুরোপুরি ইনসাফ প্রদর্শন করেননি তা তুলে ধরা। আবূ শায়বা যয়ীফ হলেও তার হাদীসকে জাল আখ্যা-দেওয়া যেতে পারে এমন পর্যায়ের নন। তাইতো আলবানী সাহেবের পূর্বে কেউ তার এই হাদীসকে জাল বলেননি। বরং ইমাম বায়হাকী র. তারাবীর রাকাত সংখ্যার জন্যে যে অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন তার অধীনে আবূ শায়বার এ হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন।

তিন, আলবানী সাহেব এও উল্লেখ করেছেন, আবূ শায়বার হাদীসে বলা হয়েছে, নবী স. রমযান মাসে জামাত ছাড়া নামায পড়েছেন। এটি হযরত জাবের রা. ও হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসের বিরোধী। তার মানে হযরত আয়েশা ও হযরত জাবির রা. এর হাদীসে জামাতের সঙ্গে নামায পড়ার কথা আছে, আর আবূ শায়বা বর্ণিত এ হাদীসে *জামাত ছাড়া* নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যাস, তাই এটি জাল। এমন কথা কোন আলেমের মুখে শোভা পায়না। প্রথমত, ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমায়দ ও তাবারানীর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে *জামাত ছাড়া* কথাটি নেই। শুধু বায়হাকীর বর্ণনায় একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যকথায়, ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও আলী ইবনুল জাদ দুজনই আবূ শায়বা থেকে ঐ শব্দটি ছাড়া হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শুধু মানসূর ইবনে আবূ মুযাহিম ঐ শব্দটির কথা উল্লেখ করেছেন। আর মানসূরের তুলনায় ঐ দুজন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই তাদের বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করবে। দ্বিতীয়ত, যদি *জামাত ছাড়া* কথাটিকে সহীহ ধরেও নেওয়া হয়, তবে এটাকে ভিন্ন ঘটনা আখ্যা দিলে তো আর কোন বিরোধিতা থাকেনা। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, তারা কয়েকজন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারাবীতে দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে নামায সংক্ষিপ্ত করে ভেতরে চলে যান। (মুসলিম, ১১০৪)। এ ঘটনাটিও হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। তাই বলে কি এটিকেও জাল বলতে হবে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. তো বলেছেন,

والظاهر أن هذا في قصة أخرى

অর্থাৎ বাহ্যত এটা ভিন্ন কোন ঘটনা হয়ে থাকবে। (ফাতহুল বারী, ৩খ, ৮পৃ)

অধিকন্তু পূর্বেও বলেছি, হযরত জাবির রা. এর হাদীসটিও দুর্বল। আলবানী সাহেব এটি সম্পর্কে ধোঁকায় পড়েছেন। তাই বারবার আলোচ্য হাদীসকে হযরত জাবির রা. এর হাদীসের বিপরীত বলে এটিকে জাল আখ্যা দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছেন। হযরত জাবির রা. এর হাদীসটি শেষ দিকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অর্থ: হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর আমলে সাহাবায়ে কেরাম রমযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন। (বায়হাকী , আসসুনানুল কুবরা ২/৪৯৬)

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার নীচে বায়হাকী পর্যন্ত এই হাদীসের দুটি সনদ আছে। একটি সনদ ইমাম বায়হাকী তার 'আসসুনানুল কুবরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অপর সনদটি তিনি উল্লেখ করেছেন তার 'আল-মারিফা' গ্রন্থে। প্রথম সনদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইমাম নববী, ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আয়নী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা নিমাভী হিন্দী র. প্রমুখ। আর দ্বিতীয় সনদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তাজুদ্দীন সুবকী ও মোল্লা আলী কারী প্রমুখ। তার মানে মূল হাদীসটি সাত জন বড় বড় মনীষীর দৃষ্টিতে সহীহ। (দ্র, নবীজীর নামায, পৃ ৪০৯, রাকাতে তারাবী, পৃ ৫৪)। মোবাকরকপুরী ও আলবানী সাহেবের পূর্বে কোন মনীষী এই হাদীসকে যয়ীফ বলেননি।

লা-মাযহাবী বন্ধুরা প্রথম সনদটির কথা উল্লেখই করেননি। দ্বিতীয় সনদটি এনে তারা যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি। তারা বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ যয়ীফ। হাদীসের সনদে ১.আবূ উসমান বাসরী রয়েছে, সে হাদীসের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত; ২. খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ রয়েছে, সে যয়ীফ, তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত, তার কোন বর্ণনা দলিল হিসেবে গন্য নয়, তদুপরি সে ছিল শিয়া ও মিথ্যাবাদী (তাহযীব, ২য় খন্ড); ৩.ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা রয়েছে, তার সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। (মিযানুল ই'তিদাল, তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খন্ড)

কথাগুলো পড়ে আমি মাথায় হাত দিয়েছি। মনে মনে বলেছি, এদের কি আখেরাতের ভয়ও নাই? ভয় থাকলে তারা এমন ডাহা মিথ্যা কথা লিখল কিভাবে? এরা বর্ণনাকারীর নামও শুদ্ধ করে লিখতে পারেনা। মাখলাদকে তারা মুখাল্লাদ বানিয়েছে। আবুল হাসনা কে আবুল হাসানা লিখেছে। রুফাই কে রাফে নামে উল্লেখ করেছে। এক পৃষ্ঠায় তিনটি ভুল। এত বড় বড় ডিগ্রীধারী সম্পাদকরা এমন ভুল করবেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।

খালিদ ইবনে মাখলাদ ও ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা দুজনই বুখারী ও মুসলিম শরীফের রাবী । তাদের সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হলে বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাদের বর্ণিত হাদীসগুলোর কি দশা হবে? ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কি মিথ্যুকের হাদীসও গ্রহণ করেছেন? হায়, হায়!!

বন্ধুগণ! এভাবে লাগামহীন ও অসত্য কথা বলে হাদীস অস্বীকারকারী জঙ্গীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবেননা, এই অনুরোধ রাখছি আপনাদের কাছে।

পাঠক, সত্যি বলছি, যে কিতাব দুটির উদ্ধৃতি তারা দিয়েছেন, তাতে এসব কথার গুষ্ঠিও নেই। আরবী কোন কথাটির অর্থ যে তারা লিখেছেন 'তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত' তা আমরা বুঝতে পারছিনা। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আমাদের এই বন্ধুরা মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী হাসিল করলেও তারা আরবীও বোঝেননা, বাংলাও না।

খালিদ কে উসমান ইবনে আবী শায়বা র., সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ র., ইবনে হিব্বান র. ও ইবনে শাহীন র. প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে মাঈন বলেছেন, ما به بأس অর্থাৎ তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। আবূ দাউদ ও ইবনে হাজার র. তাকে সাদূক বা সত্যবাদী বলেছেন। ইবনে আদী র. বলেছেন,

هو عندي إن شاء الله لا بأس به

অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ আমার দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী তার সরাসরি ছাত্র ছিলেন।

হ্যাঁ, ইমাম আহমাদ র. প্রমুখ বলেছেন, له مناكير অর্থাৎ তার কিছু কিছু বর্ণনা আপত্তিকর। (সম্ভবত এ শব্দটির অর্থই তারা করেছেন- প্রত্যাখ্যাত)। ইবনে আদী র. ঐ ধরণের বর্ণনাগুলো উদ্ধৃতও করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারীর ভূমিকায় তার সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন:

أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما و لم يكن داعية إلى رائه

অর্থাৎ বাকি রইল তার শিয়া হওয়ার ব্যাপারটি । এসম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলেছি, তিনি যখন হাদীস গ্রহণ ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মজবুত ছিলেন, তাই তার শিয়া হওয়াটা ক্ষতিকর নয়। বিশেষ করে এ কারণে যে, তিনি তার মতবাদের প্রতি কাউকে দাওয়াত দিতেননা।

এসব কথা 'তাহযীবুত তাহযীব', 'ফাতহুল বারী' ও 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি মিথ্যাবাদী ও তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত- এমন কথা কোন

গ্রন্থেই নেই। কোন মুহাদ্দিসই তাঁর সম্পর্কে বলেননি। এটা তাঁর উপর লা-মাযহাবীদের বড় অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

যাহোক, তাঁর কিছু কিছু বর্ণনায় আপত্তি থাকলেও আলোচ্য হাদীসটি তার অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ একে তো এতে আপত্তির কিছুই নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি ছাড়াও অন্য সনদে ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা র. সম্পর্কে তো তাদের বক্তব্য আরো মারাত্মক। ইয়াযীদ ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, সিহাহ সিত্তার রাবী। বুখারী র. ও মুসলিম র. তার সূত্রে বহু হাদীস গ্রহণ ও উদ্ধৃত করেছেন। আবূ হাতিম র., নাসায়ী র. ও ইবনে সাদ র. তাকে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে মাঈন র. বলেছেন, ثقة حجة অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। আছরাম র. এর বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদও তাকে ছিকাহ বলেছেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। এই শব্দটির অর্থ হয়তো তারা করেছেন প্রত্যাখ্যাত। আর *তার সকল বর্ণনা* কথাটি নিজেদের পকেট থেকে জুড়ে দিয়েছেন। অথচ ঐ শব্দটির সাধারণ অর্থ আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। কিন্তু ইমাম আহমাদ এই অর্থে শব্দটি ব্যাবহার করতেননা। কোন বর্ণনাকারী কিছু কিছু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি নিঃসঙ্গ হন তার ক্ষেত্রেই তিনি ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। ফাতহুল বারীর ভূমিকা গ্রন্থে ইবনে হাজার র. ইয়াযীদের আলোচনাতেই এই কথা পরিস্কার করেছেন।

বাকি রয়ে গেলেন আবূ উসমান। তিনি প্রত্যাখ্যাত এমন কোন কথা কোন কিতাবে নাই। তার নাম আমর ইবনে আব্দুল্লাহ। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ তাহির র. ও হাসান ইবনে আলী ইবনে মুআম্মাল তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তার বর্ণিত বহু হাদীস বায়হাকী র. তার সুনানে উদ্ধৃত করেছেন। কোন মুহাদ্দিসই তাকে যয়ীফ বলেননি। এধরণের অনেক রাবী বুখারী ও মুসলিম শরীফেও আছে। তাছাড়া আবূ উসমানের সূত্র ছাড়াও হাদীসটির অন্য আরেকটি সহীহ সূত্র আছে। তাই তার কারণে মূল হাদীসটির উপর কোন প্রভাব পড়বেনা।

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হলো, হযরত উমর রা. এর আমলে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সাহাবায়ে কেরাম -যাদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার সকলেই ছিলেন- মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবী পড়তেন। এতে তাঁদের কেউ কোন আপত্তি করেননি। এটাকেই সাহাবীগণের ইজমা বা সম্মিলিত কর্মপন্থা বলা হয়।

হযরত উমর রা. এর আমলে যে বিশ রাকাত তারাবী পড়া হতো সে কথা শুধু সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেছেন তা নয়, আরো চারজন শীর্ষ তাবেয়ীও একই কথা বলেছেন।

ক. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী র. এর বক্তব্য:

إن عمر رض أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة

অর্থাৎ হযরত উমর রা. জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সাহাবীদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৬৪।

এই বর্ণাটির সনদ সহীহ। তবে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ যেহেতু হযরত উমর রা. এর যুগ পাননি, আবার কার কাছ থেকে শুনেছেন তাও বলেননি, এই কারণে এটিকে মুনকাতি' বা সূত্র-বিচ্ছিন্ন বলা হয়। কিন্তু যেহেতু এই ধরণের তাবেয়ীগণের উস্তাদ পর্যায়ে দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলনা বললেই চলে, তাই তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তদুপরি তিনি একা নন। আরো তিনজন তাবেয়ী একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তাই এগুলো পূর্ববর্তী সহীহ ও অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির সমর্থক ও অতিরিক্ত সাক্ষী হিসেবে গণ্য হতে পারে। লা-মাযহাবী বন্ধুরা এই বর্ণনাটির ব্যাপারে সূত্রবিচ্ছিন্নতার আপত্তি ছাড়াও আরো তিনটি আপত্তি পেশ করেছেন। দুটি আলবানী সাহেবের উদ্ধৃতিতে। অপরটি নিজেদের পক্ষ থেকে।

প্রথম আপত্তিটি হলো, এই হাদীসটি হযরত উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠিত হাদীসের বিপরীত। হাদীসটি হলো- হযরত উমর রা. দুজন সাহাবী হযরত উবাই বিন কাব ও তামীম দারীকে (রমযান মাসে) ১১ রাকাত পড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ২৫৩)।

ইমাম মালেক র. এই হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের সূত্রে সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বর্ণিত এ হাদীসে রাকাত-সংখ্যা নিয়ে তার ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মালেক র. ১১ রাকাতের কথা বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ১৩ রাকাতের কথা বলেছেন। আর দাউদ ইবনে কায়স ২১ রাকাতের কথা বলেছেন। শেষোক্ত সংখ্যাটি মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে দাউদ থেকে উদ্ধৃত। (দ্র, হাদীস নং ৭৭৩০)। দাউদ ইবনে কায়স একাই যে বলছেন তাও নয়। আব্দুর রাযযাক বলেছেন, عن داود وغيره অর্থাৎ দাউদের সঙ্গে আরো কেউ কেউ ২১ রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লিখিত ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসটিতে এ ধরণের মতভেদ নেই। আবার দীর্ঘ বারশ' বছরের ইতিহাসে কোন মনীষী আট রাকাত তারাবীর প্রবক্তা ছিলেন না, এর উপর কারো আমলও ছিলনা। বরং এর বিপরীতে হযরত উমর রা. এর যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিশ রাকাত বা তার বেশী তারাবীর প্রচলন চলে আসছে। এসব কারণে অনেকে এগার রাকাতের বর্ণনাকে বর্ণনাকারীর ভুল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) ইমাম মালেক র. এর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই এগার রাকাতের বর্ণনাকে ইমাম মালেকের ভুল আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। একেই বলা হয় ইনসাফ।

আবার কেউ কেউ এটাকে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের ভুল বলেও মন্তব্য করেছেন। (দ্র, আওজাযুল মাসালিক, ১খ, ৩৯৪পৃ)। তাছাড়া দুটি বর্ণনার মধ্যে কেউ কেউ সমন্বয় সাধন করেও পরস্পর বিরোধিতা দূর করেছেন। তারা বলেছেন, প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন এগারো রাকাত পড়া হতো। পরে কেরাত কিছুটা হালকা করে রাকাত বাড়িয়ে বিশে উন্নীত করা হয়েছিল। তখন থেকেই বিশ রাকাত পড়ার ধারা অব্যাহত থাকে। ইমাম বায়হাকীসহ আরো কিছু মনীষী এরূপ সমন্বয়ের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। **দ্বিতীয় আপত্তি** হলো, বিশ রাকাতের এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী।

এখানে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত তাহাজ্জুদের এগারো রাকাত সম্পর্কিত হাদীসটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এটি আমরা শেষ দিকে উল্লেখ করবো। সেখানেই প্রমাণিত হবে আলোচ্য হাদীসটি ঐ হাদীসের বিরোধী নয়।

তৃতীয় আপত্তি লা-মাযহাবী বন্ধুরা করেছেন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের ব্যাপারে। এটাকে আপত্তি না বলে জালিয়াতি বললে অত্যুক্তি হবেনা।

তারা বলেছেন, তাছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে কেউ কেউ মিথ্যাবাদীও বলেছেন। যেমন, ইমাম আবূ হাতিম র. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত কোন কথাই সত্য নয়, বরং প্রত্যাখ্যাত । কারণ সে হলো মিথ্যাবাদী। (জরহে আততাদীল, ৯ম খন্ড; তাহযীবুত তাহযীব ৬ষ্ঠ খন্ড)।

হায়, হায়! ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বিখ্যাত তাবেয়ী, ইমাম মালেকের উস্তাদ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নাকি কোন কথাই সত্য নয়, তিনি নাকি মিথ্যাবাদী। কথাগুলো পড়ে কান্না আসার উপক্রম।

^ List

ইলমে হাদীস আজ কোন অযোগ্য ও অশুভ লোকদের হাতে এসে পড়েছে? দুটি উদ্ধৃতির কোথাও এমন কথা নেই, থাকতে পারেনা। তাঁকে তো কেউ যয়ীফও বলেননি, মিথ্যাবাদী বলাতো দূরের কথা।

এজন্যেই আমি সাধারণ আহলে হাদীস ভাইদের বলি, আপনারা কাদের অন্ধ অনুসরণ করছেন ভেবে দেখুন। যারা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে এমন ডাহা মিথ্যা তথ্য পেশ করতে পারে, তারা ইমাম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে আপনাদেরকে কত ভুল ধারণায় ফেলে রাখতে পারে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত নসীব করুন।

খ. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই র. এর বক্তব্য:

عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث.

অর্থ: আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই র. (তারা লিখেছেন, রাফে) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কাব রা. রমযানে মদীনা শরীফে লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৬৬।

এ হাদীসটির অনুবাদে তারা জালিয়াতি করেছেন। 'পড়তেন' এর স্থলে তারা লিখেছেন 'পড়েছেন'। অথচ সাধারণ আরবী জানা লোকও বুঝেন, كان يصلي অর্থ 'পড়তেন', 'পড়েছেন' নয়। যেহেতু 'পড়তেন' কথাটি নিয়মিত পড়াকে বোঝায়, আর 'পড়েছেন' কথাটি তা বোঝায় না, তাই এই জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এর উল্টো পরবর্তী হাদীসটিতে আছে,

عن أبي بن كعب أنه صلى في رمضان ....

অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, তিনি রমযানে পড়েছেন ----। এখানে صلى অর্থ 'পড়েছেন'। অথচ তারা অর্থ করেছেন- 'আদায় করতেন'। এখানেও তারা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন।

তাইতো আমি বলি, বুখারী শরীফের পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো যদি না থাকতো তবেই দেখা যেত বাবু সাহেবরা কত হাজার ভুলের শিকার হয়েছেন।

যাহোক, হাদীসটি একজন তাবেয়ীর সাক্ষ্য। তিনি উমরী যুগ পাননি। একে মুহাদ্দিসগণ মুনকাতি' বা মুরসাল বলে থাকেন। অর্থাৎ যার সূত্র বিচ্ছিন্ন। সূত্র-

বিচ্ছিন্ন হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ এ কারণেই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, মাঝখানে কোন দুর্বলব্যক্তি থেকে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু আব্দুল আযীয র. তাবেয়ী ছিলেন। তার উস্তাদগণের মধ্যে দুর্বল কেউ নাই বললেই চলে। তাছাড়া তিনি একা নন। তার মতো আরো তিনজন একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অধিকন্তু এগুলো পূর্বোল্লিখিত অবিচ্ছিন্ন ও সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অতিরিক্ত সাক্ষী ও সমর্থক। তাই এতে কোন অসুবিধা নেই।

এ হাদীসটির ব্যাপারেও তারা সূত্রবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ ছাড়া আরও দুটি অভিযোগ এনেছেন। এক. এটি হযরত উমর রা. বর্ণিত হাদীসের বিরোধী। দুই. অনুরূপ এটি হযরত উবাই রা. এর সপ্রমাণিত বর্ণনার বিরোধী।

হযরত উমর রা. এর হাদীসের বিরোধী না হওয়ার বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আর হযরত উবাই রা. এর হাদীসটি দুর্বল। তদুপরি সেটা একদিনের ঘটনা মাত্র। সুতরাং সেটির বিরোধী হওয়ার প্রশ্নই আসেনা।

গ. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রূমান র. এর বক্তব্য:

عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة

অর্থ: ইয়াযীদ ইবনে রূমান র. বলেন, হযরত উমর রা. এর যুগে লোকেরা রমযান মাসে ২৩ রাকাত নামায পড়তেন। (মুয়াত্তা মালিক, ৪০)

এটিও একজন তাবেয়ীর সাক্ষ্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটিকে মুনকাতি' বা মুরসাল বলা হয়। কারণ ইয়াযীদ ইবনে রূমান হযরত উমর রা. এর যুগ পাননি। এটিকে যয়ীফ বলা উচিত নয়। কেউ যয়ীফ বলেনও নি। সকলে মুনকাতি' বা মুরসাল বলেছেন। অথচ লা-মাযহাবী বন্ধুরা বায়হাকী র., নববী র. যায়লায়ী র. ও আইনী র. এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন - তারা এটিকে যয়ীফ বলেছেন। এটা তাদের একটি জালিয়াতি । এ ধরণের মুনকাতি' বা সূত্র বিচ্ছিন্ন হাদীসকে যয়ীফ বলা হাদীসের শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্পর্কে দৈন্যতা ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া র. লিখেছেন,

والمرسل الذي له ما يوافقه أوالذي عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء

অর্থাৎ যে সূত্র বিচ্ছিন্ন হাদীসের অনুকূলে অন্য কোন কিছুর সমর্থন থাকে কিংবা পূর্বসূরিগণের আমল পাওয়া যায় সেটি ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণযোগ্য। (আল ফাতাওয়াল কুবরা, ৪খ, ১৭৯পৃ)

ঘ. তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী র. এর বক্তব্য:

عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثلاث.

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে কাব র. বলেন, হযরত উমর রা. এর যুগে রমযানে লোকেরা বিশ রাকাত পড়তেন। তাতে তারা দীর্ঘ কেরাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। (ইবনে নাস্‌র মারওয়াযী, কিয়ামুল লায়ল, পৃ ৯১)

এসব দলিল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, হযরত উমর রা. এর যুগে বিশ রাকাতই পড়া হতো। আহলে হাদীস দলের কিছু সংখ্যক আলেম ছাড়া সারা পৃথিবীর সকল আলেম একথা স্বীকার করেছেন এবং করেন। অবশ্য এই দলের একজন বড় আলেম মাওলানা গোলাম রাসূলও ২০ রাকাত তারাবীর ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. লিখেছেন,

وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة

অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবীই হযরত উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত। সাহাবীগণের এক্ষেত্রে কোন দ্বিমত ছিলনা। (আল ইসতিযকার , ৫খ, ১৫৭পৃ)

ইমাম ইবনে কুদামা র. আল মুগনী গ্রন্থে বিশ রাকাতকে দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন,

ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع

অর্থাৎ উমর রা. যা করেছেন এবং তাঁর আমলে সাহাবীগণ যে বিষয়ে একমত হয়েছেন তাই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত। (দ্র, ২খ, ৬০৪পৃ)

আল্লামা ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

انه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار و لم ينكره منكر

অর্থাৎ একথা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কাব রা. রমযানে তারাবীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তেন। এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত এটাই সুন্নত। কেননা তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই তা আদায় করেছিলেন। কেউ তাতে আপত্তি করেননি।(মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৩খ, ১১২-১৩পৃ)

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী র. তার 'আলমানহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,

ثم التراويح وهي عشرون ركعة في كل ليلة من رمضان وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رض

অর্থাৎ তারাবী রমযানের প্রত্যেক রাতেই বিশ রাকাত করে। বিশ রাকাতের নির্ণয়ণ একটি দুর্বল হাদীসে আসলেও সাহাবীগণ এর উপর সকলে একমত হয়েছিলেন।(দ্র, পৃ ২৪০)

ইমাম আবূ হানীফা র. এর চমৎকার বিশ্লেষণ:

روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر فقال: التراويح سنة مؤكدة و لم يتخرصه عمر من تلقاء نفسة و لم يكن فيه مبتدعا و لم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون، منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.

অর্থাৎ আসাদ ইবনে আমর র. ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা র.কে তারাবী ও এ ব্যপারে হযরত উমর রা.এর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারাবী সুন্নতে মুয়াক্কাদা। হযরত উমর রা. অনুমান করে নিজের পক্ষ থেকে এটা নির্ধারণ করেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি নতুন কিছু উদ্ভাবন করেননি। তিনি তাঁর নিকট বিদ্যমান ও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ প্রদান করেছেন। তাছাড়া হযরত উমর রা. যখন এই নিয়ম চালু করলেন এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতিতে লোকদেরকে একত্রিত করলেন, ফলে তিনি জামাতের সাথে এই নামায আদায় করলেন, তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, তালহা, যুবায়র, মুআয ও উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ ছিলেন। তাঁদের কেউই তাঁর উপর আপত্তি করেননি। বরং সকলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন এবং অন্যদেরও এরই আদেশ দিয়েছেন।(আল ইখতিয়ার লি তালীল মুখতার,১/৭০)

ইমাম সাহেবের এই সারগর্ভ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২০ রাকাত তারাবী রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ নির্দেশে না হলেও তাঁর পরোক্ষ নির্দেশেই হয়েছিল। উসূলে ফিকহের পরিভাষায় এটাকে মারফূ হুকমী বলা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই কোন একজন সাহাবীর কোন কথা বা কর্ম যা ইজতিহাদের আওতাবহির্ভূত, সকল ফকীহ ও আলেমের দৃষ্টিতে মারফূ হুকমী (অর্থাৎ এর পেছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা ছিল) বলে গণ্য, তখন হযরত উমর রা. এর মতো ব্যক্তির উদ্যোগ এবং সকল সাহাবীর ঐকমত্য পোষণ কেন মারফূ হুকমী হবে না? কোন নামাযের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ

ইজতিহাদের আওতা-বহির্ভূত ব্যাপার। সুতরাং এর পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অবশ্যই ছিল বলতে হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার র. তাঁর 'আততামহীদ' গ্রন্থে কত সুন্দর লিখেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নতুন কিছু করেননি। তিনি তাই করেছেন যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। কিন্তু শুধু এ আশংকায় যে, নিয়মিত জামাতের কারণে তারাবী উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যেতে পারে জামাতের ব্যবস্থা করে যাননি। হযরত উমর রা. এই বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এখন আর এই আশংকা নেই, কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং শরীয়ত নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তখন তিনি নবী-পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হি. সনে জামাতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা যেন এই মর্যাদা তাঁর ভাগ্যেই নির্ধারিত রেখেছিলেন। (দ্র.৮খ, ১০৮,১০৯পৃ.)

লা-মাযহাবী বন্ধুরা কখনো বলেন, বিশ রাকাত তারাবী হযরত উমর রা. থেকে প্রমাণিত নয়। তিনি এগার রাকাতেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার কখনো বলেন, এটা হযরত উমর রা. এর কর্ম, যার পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ছিল না।

হরত উমর রা. যদি এগারো রাকাতের আদেশই দিয়ে থাকেন, তবে তার আদেশ লংঘন করে কারা কখন থেকে বিশ রাকাত তারাবীর নিয়ম চালু করলো, সেটা তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু কখনোই তারা সেটা প্রমাণ করতে পারবেনা।

আর হযরত উমর রা. এর কর্মের পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ছিলনা, এটা কেমন কথা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি, আমার সুন্নত ও খুলাফায়েরাশেদীনের সুন্নত তোমরা আকড়ে ধরবে। তিনি কি বলেননি, তোমরা আমার পরে আবূ বকর ও উমরকে অনুসরণ করবে?

আল্লামা ইবনুল হুমাম র. কত চমৎকার বলেছেন,

وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين وقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ندب إلى سنتهم

অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত তোমরা আঁকড়ে ধর- এতে তাঁদের সুন্নতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্র, ফাতহুল কাদীর ১খ, ৪৮৬পৃ)

৩ নং দলিল: হযরত আলী রা. এর কর্মপন্থা:

عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة قال: وكان علي يوتر بهم

অর্থ : আবূ আব্দুর রহমান সুলামী র. হযরত আলী রা. সম্পর্কে বলেন, তিনি রমযানে হাফেজদেরকে ডাকলেন এবং তাদের একজনকে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, হযরত আলী রা. নিজে তাদের নিয়ে বিতর পড়তেন। (সুনানে বায়হাকী, ২খ, ৪৯৬,৪৯৭পৃ)

এই হাদীসটি বায়হাকী র. অন্য আরেকটি বর্ণনাকে শক্তিশালী করার জন্যে এনেছেন। এতে বোঝা যায়, এটিও তার দৃষ্টিতে মজবুত বর্ণনা। তাছাড়া ইবনে তায়মিয়া র. 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে (২/২২৪) ও যাহাবী র. 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে (৫৪২) এটিকে দলিলরূপে পেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, হযরত আলী রা. তারাবীর জামাত, রাকাত-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. এর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন।

হযরত আলী রা. থেকে ভিন্ন একটি সনদেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি এরূপ:

عن أبي الحسناء أن عليا أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة

অর্থ: আবুল হাসনা (তারা লিখেছেন, হাসানা- এটা ভুল) থেকে বর্ণিত। হযরত আলী রা. রমযানে জনৈক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছিলেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৬৩।

লা-মাযহাবী বন্ধুরা প্রথম বর্ণনাটি উল্লেখই করেননি । দ্বিতীয় বর্ণনা উল্লেখ করে তারা দুটি হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও বায়হাকী ২/৪৯৬। এরপর তারা লিখেছেন, ইমাম বায়হাকী বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

এখানে বায়হাকী র. এর উদ্ধৃতিটি ভুল। বায়হাকী র. এটি উদ্ধৃত করেননি। বরং প্রথম বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন,

وروينا ذلك من وجه آخر عن علي رض

অর্থাৎ এই হাদীসটি হযরত আলী রা. থেকে ভিন্ন একটি সনদে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ধারণা করা হয়, তিনি হয়তো মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার আবুল হাসনার বর্ণনাটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

এরপর তারা বায়হাকীর যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন তাতো পুরোপুরি জালিয়াতি এবং ডাহা মিথ্যা। বায়হাকী র. এমন কথা কোথাও বলেননি।

এরপর তারা লিখেছেন, আল্লামা আলবানী র. বলেন, এতে আবুল হাসানা ত্রুটিযুক্ত। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী র. লিখেছেন, সে কে তা জানা যায়নি। হাফেজ র. বলেছেন, সে অজ্ঞাত। আবুল হাসানা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। মিযানুল ই'তিদাল ১ম খন্ড, যয়ীফ সুনানুল কুবরা ২য় খন্ড, বায়হাকী।

এ হলো আলবানীর অন্ধ অনুসারীদের শেষ তহবিল। আলবানী ভুল করেছেন তো তারাও ভুল করেছেন। একই ভুল করেছেন মোবারকপুরীও। আসলে যাহাবী ও হাফেজ ইবনে হাজার র. যে আবুল হাসনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি আর এই আবুল হাসনা দুই ব্যক্তি। ইনি হযরত আলী রা.এর শাগরিদ আর উনি হযরত আলী রা. এর ছাত্রের ছাত্র হাকাম ইবনে উতায়বার শাগরিদ। এই আবুল হাসনার ছাত্র আমর ইবনে কায়স ও আবূ সাদ আল বাক্কাল, আর ঐ আবুল হাসনার ছাত্র শারীক নাখায়ী। ঐ আবুল হাসনাকে ইবনে হাজার র. 'তাকরীবে' ৭ম স্তরের বলে উল্লেখ করেছেন। আর এই আবুল হাসনার ছাত্র আবূ সাদ বাক্কালকে ৫ম স্তরের উল্লেখ করেছেন। তাহলে তার উস্তাদ আবুল হাসনা অবশ্যই ৩য় বা ৪র্থ স্তরের হয়ে থাকবেন। সুতরাং দুজন এক ব্যক্তি হয় কিভাবে? তাছাড়া ইবনে হাজার র. তাকরীবের ভূমিকায় লিখেছেন, যে ব্যক্তি থেকে শুধু একজন ছাত্র হাদীস বর্ণনা করেছে, আর কেউ তাকে ছিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেননি তাকেই আমি মাজহুল বা অজ্ঞাত বলে পরিচয় দেব। তার এ কথার আলোকেও বোঝা যায়, এই আবুল হাসনাকে তিনি মাজহুল বা অজ্ঞাত বলেননি। কারণ তার থেকে দুজন ছাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহোক, এতটুকু তো ছিল ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু এর পরে তারা হাফেজ ইবনে হাজার র. এর বক্তব্য হিসেবে একথা লিখেছেন, আবুল হাসানা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত. এটা নিঃসন্দেহে জালিয়াতি। হাফেজ ইবনে হাজার একথা বলেননি।

আমাদের আলোচ্য আবুল হাসনাকে *মাসতূর* বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যার একাধিক বর্ণনাকারী ছাত্র আছে, কিন্তু তার ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে সুনাম বর্ণিত হয়নি। মাসতূরের বর্ণনা অনেকেই নিঃশর্তে গ্রহণ করেছেন। এর জন্যে 'আর রাফউ ওয়াত তাকমীলে'র পরিশিষ্ট দেখা যেতে পারে। কেউ কেউ শর্ত আরোপ করেছেন সমর্থক বর্ণনাকারীর। অর্থাৎ তার সমর্থনে যদি অন্য কোন ব্যক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে তাও পাওয়া যাচ্ছে। আবুল হাসনার মতো আবূ আব্দুর রহমান সুলামীও হযরত আলী রা. থেকে একই কথা উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতিটি 'শারহুন নুখবা'য়ও বিধৃত হয়েছে। হযরত আলী রা. যে বিশ রাকাত তারাবী শিক্ষা দিয়েছেন, তা এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা, সাঈদ ইবনে আবূল হাসান, সুয়াইদ ইবনে গাফালা ও আলী

ইবনে রাবীআ প্রমুখ বিশ রাকাত তারাবী পড়াতেন ও পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, সুনানে বায়হাকী, ২/৪৯৮; কিয়ামুল লাইল লি ইবনে নাসর, পৃ২০০-২০২)।

৪. বিভিন্ন শহরে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমল:

ক. মক্কা শরীফের আমল:

সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে মদীনা শরীফে যেমন বিশ রাকাত তারাবী পড়া হতো, মক্কা শরীফেও তেমনি বিশ রাকাতই পড়া হতো। আতা ইবনে আবূ রাবাহ (মৃত্যু, ২১৪ হি)- যিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন এবং বহু সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎলাভে ধন্য ছিলেন, মক্কা শরীফেই তার নিবাস ছিল- বলেছেন,

أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر

অর্থাৎ আমি লোকদেরকে (সাহাবা ও প্রথম সারির তাবেয়ীদেরকে) পেয়েছি তারা বিতর সহ ২৩ রাকাত পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৭৩।

এমনি ভাবে ইবনে আবী মুলাইকা র. মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সেখানকার কাজি (বিচারক) ও মুয়াজ্জিন ছিলেন। ১১৭ হি. সনে তার ওফাত হয়। তার সম্পর্কে নাফে' ইবনে উমর বলেন,

كان يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة

অর্থাৎ আমাদেরকে নিয়ে তিনি বিশ রাকাত পড়তেন।

ইমাম শাফেয়ী র.ও মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ২০২ হি. সালে তাঁর ওফাত হয়। তিনি বলেছেন, هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين অর্থাৎ অনুরূপ ভাবে আমি আমাদের শহর মক্কা শরীফে পেয়েছি,তারা বিশ রাকাত নামায পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ)

ইমাম শাফেয়ী র.ও যেহেতু বিশ রাকাত তারাবীকে অবলম্বন করেছেন, তাই তাঁর অনুসারীরা মক্কা ও অন্যান্য স্থানে বিশ রাকাতের উপরই আমল করতেন। মক্কার হারাম শরীফে চালু হওয়া এ আমল আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

সাহাবা যুগের শেষ দিকে মদীনাবাসীগণ যখন দেখলেন মক্কাবাসীগণ বিশ রাকাত তারাবী পড়েন বটে, কিন্তু তারা প্রত্যেক তারবীহার (বিশ্রামের জন্যে বিরতি) সময় তওয়াফ করে অতিরিক্ত ফায়দা লাভ করছেন তখন থেকে তারা সেখানে প্রত্যেক তারবীহার সময় চার রাকাত বাড়িয়ে পড়তে লাগলেন। এভাবে সেখানে

২০+১৬=৩৬ রাকাত পড়ার প্রচলন হতে থাকে কেউ আরো দু'রাকাত যোগ করে ৩৮ রাকাত পড়তে থাকেন এভাবে তিন রাকাত বিতর সহ তাদের ৩৯ বা ৪১ রাকাত হতো।

ইমাম মালেক র. মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ১৭৯ হি. সনে তার ওফাত হয়. তিনি বলেছেন, হাররার ঘটনার (যা ৬৩ হি সনে ঘটেছিল) পূর্ব থেকে একশো বছরের অধীক সময় জুড়ে মদীনা শরীফে ৩৮ রাকাত তারাবী পড়া হতে থাকে সালেহ মাওলাত তাওয়ামা র. (তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন) এর বর্ণনাও অনুরূপ।

মুআয আবূ হালীমা রা. সাহাবী ছিলেন এবং তিনি হাররার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনে সীরীন র. সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ৪১ রাকাত তারাবী পড়াতেন। এ তিনটি বর্ণনা 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থেও বিধৃত হয়েছে।(দ্র, ২খ, ৭২পৃ)

নাফে র. ছিলেন হযরত ইবনে উমর রা. এর আযাদকৃত দাস। হযরত আয়েশা রা., আবূ হুরায়রা রা. ও আবূ রাফে রা. প্রমুখেরও ছাত্র ছিলেন তিনি ১১৭ হি সনে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর বর্ণনা হলো, আমি লোকদেরকে ৩৬ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বিতর পড়তে দেখেছি ও পেয়েছি। (দ্র, প্রাগুক্ত, ২/৭৩)

দাউদ ইবনে কায়স র. বলেন, আমি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. (মৃত্যু ১০১হি) ও আবান ইবনে উসমান র. (মৃত্যু ১০৫ হি, ইনি হযরত উসমান রা. এর ছেলে ছিলেন) এর আমলে মদীনাবাসীকে ৩৬ রাকাত পড়তে দেখেছি। (দ্র. কিয়ামুল লায়ল, পৃ৯১)।

তিনি এও বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. হাফেজদেরকে ৩৬ রাকাত পড়াতে হুকুম দিতেন. (প্রাগুক্ত, পৃ ৯০)

ইমাম মালেক র. এর এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। ২০ রাকাত ও ৩৬ রাকাত। তার অনুসারীরা ৩৬ রাকাতকেই তার মাযহাব আখ্যা দিয়েছেন। মদীনা মিশর স্পেনসহ বিভিন্ন শহরে তার অনুসারীরা ৩৬ রাকাত তারাবী পড়তে থাকেন। ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হি) এর যুগে মদীনায় ৩৬ রাকাতই পড়া হতো। (দ্র, তিরমিযী শরীফ)

শায়খ আতিয়া সালেম লেখেন,

مضت المأة الثانية والتراويح ست وثلاثون وثلاث وتر ودخلت المأة الثالثة وكان المظنون أن تظل على ما هي عليه تسع وثلاثون بما فيه الوتر

অর্থাৎ মদীনায় ২য় হিজরী শতকে তারাবী ৩৬ রাকাত ও বিতর তিন রাকাত পড়া হতো। তৃতীয় শতকেও তাই হয়ে থাকবে। (আততারাবী আকছার মিন আলফি আম, পৃ ৪১)

হিজরী ৪র্থ শতকে মদীনার এ আমল পরিবর্তিত হয়ে বিশ রাকাতে এসে পৌছেছে। শায়খ আতিয়া লেখেন,

عادت التراويح في تلك الفترة كلها إلى عشرين ركعة فقط بدلا من ست وثلاثين في السابق

অর্থাৎ এ সময়ে পূর্বের ৩৬ রাকাতের পরিবর্তে তারাবী বিশ রাকাতে ফিরে আসে। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪২) .

তখন থেকে আজ পর্যন্ত মদীনার মসজিদে নববীতে ২০ তারাবী অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, আলবানী ও মোবারকপুরী দুজনই ইমাম মালেক র. এর এগারো রাকাতের একটি মতও উল্লেখ করেছেন। এ মতটি ভুয়া । ইমাম মালেকের কোন ছাত্র বা তাঁর মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এ মতটি বর্ণিত হয়নি। জূরী নামক শাফেয়ী মাযহাবের জনৈক ব্যক্তি এ মতটির কথা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যক্তি ইমাম মালেকের কয়েকশো বছর পরে এসেছেন। তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কেও কিছু জানা যায়না। এ ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে আলবানী সাহেব এ দাবীও করেছেন, মালেক র. ২০ রাকাত পড়তে নিষেধ করতেন। সুবহানাল্লাহ!

খ. কূফাবাসীর আমল:

কূফাবাসীর আমলও মক্কা ও মদীনাবাসী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমল থেকে ব্যতিক্রম ছিলনা। কূফা ছিল হযরত আলী রা. এর দারুল খেলাফত বা রাজধানী। তিনিই তো বিশ রাকাত পড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কূফায় বসবাস করতেন। তিনিও বিশ রাকাত পড়তেন। (কিয়ামুল লাইল, পৃ.৯১)

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. ছিলেন শীর্ষ তাবেয়ী। হযরত উমর, ইবনে মাসউদ ও হুযায়ফা রা. প্রমুখ বড় বড় সাহাবীগণের সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। ৭৫ হি সনে তার ওফাত হয়। তিনিও চল্লিশ রাকাত তারাবী পড়তেন। সুয়াইদ ইবনে গাফালা ছিলেন হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখের শীর্ষ ছাত্র । তিনিও বিশ রাকাত পড়াতেন। বায়হাকী, ২/৪৯৬। হযরত আলী রা. এর শিষ্য হারেছও বিশ রাকাত পড়াতেন। আলী ইবনে রাবীআ ছিলেন হযরত আলী ও

সালমান ফারসী রা. এর সাহচর্য ধন্য। তিনিও বিশ রাকাত পড়াতেন । সাঈদ ইবনে জুবায়ের ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস রা. সহ বহু সাহাবীর শিষ্য। তিনিও বিশ রাকাতের বেশী তারাবী পড়তেন। ৯৫ হি সনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সুফইয়ানছাওরী (মৃত্যু ১৬১ হিজরী) ছিলেন কূফার বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ, সিহাহ সিত্তায় তার সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বুখারী রা. এর উস্তাদের উস্তাদ ছিলেন। তিনিও বিশ রাকাত তারাবীর পক্ষে। ইমাম আবূ হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হি) বিশ রাকাত তারাবীকে সুন্নত বলার পর তার অনুসারীরা কূফা ও অন্যান্য শহরে বিশ রাকাতই তারাবী পড়তে থাকেন। বৃটিশ আমলে এই আহলে হাদীস ফেরকার উদ্ভবের পূর্বে উপমহাদেশের সর্বত্র বিশ রাকাত তারাবীই পড়া হতো।

গ.বসরা বাসীর আমল:

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে ইরাকের বসরা নগরী ইলম ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগামী ছিল। সেখানেও কেউ বিশ রাকাতের কম তারাবী পড়তেন না। আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা, সাঈদ ইবনে আবুল হাসান ও ইমরান আবদী ৮৩ হিজরীর পূর্বে বসরার জামে মসজিদে বিশ রাকাত তারাবী পড়াতেন। (কিয়ামুল লাইল, পৃ ৯২)

যুরারা ইবনে আবূ আওফা (মৃত্যু ৯৩ হি) শীর্ষ তাবেয়ী ছিলেন। তিনিও বিশ রাকাতের বেশী তারাবী পড়াতেন।

ঘ. বাগদাদ বাসীর আমল:

বাগদাদে ইমাম আহমাদ র. (মৃত্যু ২৪১ হি) বিশ রাকাত তারাবীকে সুন্নত বলেছেন। ফলে তার অনুসারীরা বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে বিশ রাকাত তারাবী আদায় করতেন। হাম্বলী মাযহাবের সকল কিতাবে বিশ রাকাত তারাবীকে সুন্নত বলা হয়েছে। দাউদ জাহিরীও ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। তিনিও ছিলেন বিশ রাকাত তারাবীর পক্ষে।

এমনিভাবে মার্ভের অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক র. (মৃত্যু ১৮১ হি) বিশ রাকাত কে অবলম্বন করেছেন। ইসহাক ইবনে রাহাওয়ায়হ র. ৪১ রাকাতকে অবলম্বন করেছেন।

ইবনে তায়মিয়া র. এর মতেও বর্তমানে ২০ রাকাত পড়াই উত্তম। ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

والأفضل يختلف بإختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم إحتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك

অর্থাৎ তারাবী কত রাকাত পড়া উত্তম তা নির্ভর করবে মুসল্লীদের ধৈর্য্য-সৈর্য্যের উপর। তারা যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়, তবে ১০ রাকাত ও পরে তিন রাকাত পড়া - যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গায়রে রমযানে নিজের জন্যে অবলম্বন করেছিলেন- উত্তম হবে। আর যদি তারা এর সামর্থ না রাখে তবে বিশ রাকাত পড়াই উত্তম হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এ অনুযায়ীই আমল করে আসছে। কারণ এটা ১০ ও ৪০ এর মাঝামাঝি। যদি কেউ ৪০ রাকাত বা তার কমবেশি পড়তে চায় তবে সেটাও জায়েয। এর কোনটাই মাকরূহ বা অপছন্দনীয় নয়। মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৪/২২৪।

বর্তমানে মানুষের সক্ষমতার কথা সকলের জানা । তাই ইবনে তায়মিয়ার মতেও বর্তমানে বিশ রাকাত পড়াই উত্তম। আরেকটি কথাও তিনি স্পষ্ট করেছেন, চল্লিশ বা অন্য যে কোন সংখ্যায় তারাবী পড়া হোক না কেন, তা মাকরূহ হবেনা, বরং জায়েযই হবে। অথচ আলবানী সাহেব বলেছেন, জোহরের ফরজ পাঁচ রাকাত পড়া যেমন, এগারো রাকাতের বেশী তারাবী পড়াও ঠিক তেমন।এমন দুঃসাহসিক কথা আলবানী ছাড়া কে বলতে পারবে? আমাদের জানামতো সমগ্র পৃথিবীর আলেমদের কেউই এমন কথা বলেননি।

এমনকি লা-মাযহাবী আলেমদের মুরুব্বী মাওলানা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও স্পষ্ট বলেছেন, বিশ রাকাতের ভেতর যেহেতু এগারো রাকাতও অন্তর্ভূক্ত, তাই বিশ রাকাত আদায়কারীও সুন্নত অনুযায়ী আমলকারী বলে বিবেচিত হবে। (দ্র, 'আল ইন্তিকাদ'র রাজীহ, পৃ ১৩৮)

আট রাকাতের দলিল: কিছু পর্যালোচনা

আট রাকাতের পক্ষে তিনটি দলিল পেশ করা হয়:

১নং দলিল: হযরত আবূ সালামা র. হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নামায কিরূপ হতো? তিনি বললেন, রমযান ও গায়র রমযানে তিনি এগারো রাকাতের বেশী পড়তেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপর চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না। এর পর তিন রাকাত পড়তেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে বিতর পড়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন? তিনি বললেন, আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় বটে, তবে আমার কলব জাগ্রত থাকে। (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীসটি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। কিন্তু আসলে এ হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবী সম্পর্কে নয়। এটিকে তারাবী সম্পর্কে মনে করা ভুল। কারণ-

ক. এ হাদীসে সেই নামাযের কথা বলা হয়েছে যা রমযান ও অন্য সময় পড়া হতো, অথচ তারাবী রমযান ছাড়া অন্য সময় পড়া হয়না।

খ. এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে একাকী পড়তেন। অথচ তারাবী জামাতের সঙ্গে মসজিদে পড়া হয়।

গ. এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। পরে ঘুম থেকে উঠে বিতর পড়তেন অথচ তারাবীতে নামায শেষ করে বিতর পড়া হয়। তাছাড়া এখানে যে বিতর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা তিনি একাকী পড়তেন। অথচ তারাবীতে বিতর জামাতে পড়া হয়।

ঘ. এই নামায চার রাকাত, চার রাকত ও তিন রাকাত পড়া হয়েছিল। লা-মাযহাবী আলেম মোবারকপুরী তার তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন, চার রাকাত এক সালামে পড়া হয়েছিল, এমনিভাবে তিন রাকাতও এক সালামে। অথচ তারাবী দুরাকাত করে পড়া হয়।

ঙ. এই নামায যদি তারাবী সম্পর্কে হতো, তবে ফকীহগণের কেউ না কেউ এগারো রাকাতের মত পোষণ করতেন। অথচ তাদের কেউই অনুরূপ মত পোষণ করেননি। ইমাম তিরমিযী ফকীহগণের মত উল্লেখ করতে গিয়ে

বলেছেন, ইমাম মালেক র. এর মত ৪১ রাকাত, আর অধিকাংশ আলেমের মত ২০ রাকাত। ৮ রাকাতের কোন মত থাকলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। বোঝা যায়, ফকীহগণের কেউই এই হাদীসকে তারাবীর ক্ষেত্রে মনে করেননি। অথচ ইমাম তিরমিযী র. জানায়েয অধ্যায়ে লিখেছেন,

كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث

অর্থাৎ ফকীহ অনুরূপ বলেছেন, আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই অধিক জ্ঞাত।

চ. মুহাদ্দিসগণও এই হাদীসকে তারাবীর ক্ষেত্রে নয়, তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেই মনে করতেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম মালেক, আব্দুর রাযযাক, দারিমী, আবূ আওয়ানা ও ইবনে খুযায়মা র. প্রমুখ সকলেই এই হাদীসকে তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন; তারাবী বা কিয়ামে রামাযান অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি।

এমনকি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী র. তার 'কিয়ামুল লাইল' গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب عدد الركعات التي يقوم بها الإمام للناس في رمضان

অর্থাৎ অনুচ্ছেদ: রমযানে লোকদেরকে নিয়ে ইমাম যে নামায পড়বেন তার রাকাত-সংখ্যা। উক্ত অনুচ্ছেদে তিনি তারাবীর রাকাত-সংখ্যা সম্পর্কে বহু হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত আয়েশা রা. এর এ হাদীস উচ্চ মানের সহীহ হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখ করা তো দূরের কথা, এর প্রতি কোন ইশারা-ইংগিতও করেননি। এতে বোঝা যায়, তাঁর গবেষণায়ও এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে নয়, তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শুধু ইমাম বুখারী র. এ হাদীস তারাবী ও তাহাজ্জুদ উভয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর নীতি সকলের জানা। তিনি সামান্য সম্পর্কের কারণেই হাদীস পুনরুল্লেখ করেন। তিনি একথাও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, রমযানে তারাবী পড়া হলেও শেষে তাহাজ্জুদও পড়ে নেয়া উচিৎ। বুখারী র. নিজেও তারাবী পড়ে শেষরাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। ফাতহুল বারীর মুকাদ্দিমা, পৃ ৬৪৫।

ছ. এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে হলে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বিশ রাকাত পড়া আদৌ সম্ভব ছিলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর সুন্নত ও আদর্শের প্রতি তাঁদের চেয়ে অধিক মহব্বত আর কারো হতে পারে?

যারা এমন পাগল ছিলেন যে, প্রস্রাবের প্রয়োজন না হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সফরে যেখানে যেখানে প্রস্রাব করতে বসেছিলেন, ঠিক সেখানে গিয়ে বসেছেন। তাঁদের পক্ষে এমন একটি সুন্নত ছেড়ে দেওয়া কি কল্পনা করা যায়? লা-মাযহাবীদের ভূমিকা প্রমাণ করে, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশী।

জ. খোদ হযরত আয়েশা রা.ও মনে করতেননা এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে। অন্যথায় তাঁর চোখের সামনে ৪০টি বছর মসজিদে নববীতে তাঁরই হুজরার পাশে এভাবে সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা হবে, আর তিনি প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকবেন- তা হতে পারে না।

ঝ. এ হাদীস তারাবী সম্পর্কে হলে লা-মাযহাবী আলেম শাওকানী সাহেব ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কেন বলবেন: তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই?

শাওকানী সাহেব বলেছেন,

فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به سنة

অর্থাৎ তারাবী নামাযকে বিশেষ সংখ্যায় ও বিশেষ কেরাতে আবদ্ধ করার ব্যাপারে কোন হাদীস আসেনি। দ্র, নায়লুল আওতার।

নওয়ার সাহেব তো আরো স্পষ্ট করে বলেছেন,

ان صلاة التراويح سنة بأصلها ثبت أنه عليه السلام صلاها في ليالي ثم ترك شفقة على الأمة أن لا تجب على العامة أو يحسبوها واجبة و لم يأت تعيين العدد في الروايات الصحيحة المرفوعة ولكن يعلم من حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره - رواه مسلم- أن عددها كان كثيرا.

অর্থাৎ তারাবী মূলতঃ সুন্নত। একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক রাত এটি পড়েছিলেন। অতঃপর উম্মতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি এটি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আশংকা ছিল সাধারণের উপর এটি ফরজ হয়ে যায় কিনা, কিংবা তারাই এটিকে ফরজ মনে করে বসে কিনা। তবে এর

নির্দিষ্ট সংখ্যা কোন সহীহ মারফূ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে এত বেশী ইবাদতে তৎপর হতেন, অন্য মাসে এত তৎপর হতেননা। এ হাদীস থেকে এতটুকু বোঝা যায়, তারাবীর রাকাত সংখ্যা ছিল অনেক। দ্র, আল ইনতিকাদুর রাজীহ, পৃ,৬১

সুবকী র.ও তার 'শারহুল মিনহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,

اعلم أنه لم ينقل كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي هل هو عشرون أو أقل

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাতগুলোতে বিশ রাকাত না তার কম পড়েছিলেন সে কথা বর্ণিত হয়নি। দ্র, আল মাসাবীহ, পৃ ৪৪

জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. ও তার 'আল মাসাবীহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

ان العلماء اختلفوا في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه

অর্থাৎ তারাবীর রাকাত সংখ্যা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। যদি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম থেকে প্রমাণিত থাকতো, তবে এ নিয়ে তারা দ্বিমত করতেন না। দ্র, পৃ ৪২।

আল্লামা ইবনে তায়মিয়া র.ও প্রায় একই ধরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد معين موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে করবে রমযানের তারাবীর রাকাত সংখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, এতে বাড়ানো কমানো যাবেনা, সে ভুল করবে। দ্র, মিরকাত

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবী সম্পর্কে নয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া র. যে ভুলের প্রতি ইংগিত দিলেন আলবানী সাহেব সেই ভুলেই পতিত হয়েছেন।

আমরা অবশ্য বলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন-মেজায, রুচি-প্রকৃতি, আমল ও কর্ম সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে ভাল জানতেন।

সুন্নতের প্রতি তাঁদের আসক্তি, সুন্নতকে সজিব রাখার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা সকলেরই জানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশই শুধু নয়, তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন তাঁদের জীবনের বড় লক্ষ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন আরো অগ্রগামী। হযরত উমর রা. সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে নবী হওয়ার সুযোগ থাকলে উমরই হতো। (তিরমিযী) তিনি আরো বলেছেন, আমার উম্মতে মুহাদ্দাস (যার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম হয়) থেকে থাকলে সে হবে উমর। তিনি আরো বলেছেন, উমর যে পথ ধরে চলে শয়তান সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ দিয়ে চলে। এই দুটি হাদীসই বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

অন্যদিকে বেদ'আত বা নব-উদ্ভাবিত আমল ও কর্মের প্রতি সাহাবীগণের ঘৃণা ও অসন্তোষ ছিল চরম পর্যায়ের। মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে পুনরায় ডাকাডাকি করতে শুনে হযরত ইবনে উমর রা. সেই মসজিদ থেকে রাগে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেকে নামাযে সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ জোরে পড়তে শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রা. ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ছেলেকে সাবধান করে তিনি বলেছিলেন,

إياك والحدث في الإسلام

অর্থাৎ খবরদার ! ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করোনা। এদুটি হাদীস তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর রা.কে একথা বললেন, আপনার বাবাই তো এটা করতে নিষেধ করেছেন। এর উত্তরে তিনি বলেছেন, মনে কর একটি কাজ সম্পর্কে আমার বাবা নিষেধ করছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইকাজ করেছেন, তবে তুমি কোনটি ধরবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলটি নয়কি? (তিরমিযী শরীফ)

কুরআন সংকলনের ব্যাপারে যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.কে দায়িত্ব দিতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন,

كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেননি সে কাজ আপনি কিভাবে করবেন? কিন্তু হযরত উমর রা. তাঁকে ও আবূ বকর রা.কে বুঝিয়ে একাজটি করিয়ে নিয়েছেন। এটিকে কি আমরা বেদ'আতে উমরী বলবো?

এসব কথা বিবেচনায় রাখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসটি তারাবী সম্পর্কে হয়ে থাকলে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে ২০ রাকাত পড়ার উপর ঐকমত্য হওয়া আদৌ সম্ভব হতোনা। অনুরূপ ভাবে ২০ রাকাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন নির্দেশনা না থাকলে তাও তাদের পক্ষে পড়া সম্ভব হতোনা। কেউ না কেউ অবশ্যই প্রতিবাদ বা আপত্তি করে বসতেন। আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবেনা- নবীজীর এ বাণী কে না শুনেছেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রা. এর আমলে সাহাবীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে মসজিদে তারাবী পড়েছেন। উমর রা. যখন তাদের এক ইমামের পেছনে একত্রিত করতে চাইলেন, তখনই হযরত উবাই ইবনে কাব রা. আপত্তি করে বসলেন। মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী' ও জিয়া মাকদিসীর 'আল মুখতারাহ' হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আবূল আলিয়া র. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أن عمر أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيئ لم يكن فقال: قد علمت ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة.

অর্থাৎ হযরত উমর রা. উবাই রা.কে রমযানে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে আদেশ দিলেন এবং একথা বললেন যে, লোকেরা দিনভর রোযা রাখে, তারা সুন্দর ভাবে কুরআন পড়তেও পারেনা। তাই যদি আপনি রাত্রে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। তিনি তখন বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! একাজ তো ইতিপূর্বে হয়নি। তিনি বললেন, আমি তা জানি। তবে এটা উত্তম। এরপর উবাই রা. লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত পড়লেন। দ্র, আলমুখতারা, ১১৬১।

এ হাদীসের সনদ হাসান। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, জামাতে পড়ার ব্যাপারে তিনি আপত্তি করে বসলেন। কিন্তু বিশ রাকাতের ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি না করে বিনা দ্বিধায় বিশ রাকাত পড়িয়ে দিলেন। অথচ প্রথম বিষয়টি ছিল ব্যবস্থাপনাগত এবং শরীয়ওতের রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর দ্বিতীয় বিষয়টি শরীয়তের একটি বিধান। কোন নামাযের রাকাত সংখ্যা নিজের থেকে নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে যদি ৮ রাকাত পড়া নির্ধারিত থাকতো তাহলে

তিনি স্বেচ্ছায়ও বিশ রাকাত পড়াতেননা। অন্য কেউ পড়াতে বললেও তিনি আপত্তি করে বলতেন, এ কাজ তো ইতিপূর্বে হয়নি, আমি কিভাবে করবো?

২নং দলিল: হযরত উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত:

أنه صلى في رمضان بنسوة في داره ثمان ركعات

অর্থ: তিনি রমযানে তার ঘরের মহিলাদের নিয়ে আট রাকাত পড়েছেন।

অনুরূপ আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত জাবির রা. এর হাদীস: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন,

جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كان مني الليلة شيئ يعني في رمضان قال: وماذا يا أبي؟ قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال : فصليت بهن ثماني ركعات ثم أوترت

উবাই ইবনে কাব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে – তার উদ্দেশ্য হলো রমযানে- আমার থেকে একটি ব্যাপার ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উবাই! সেটা কি? তিনি বললেন,আমার ঘরের নারীরা বললো যে, আমরা তো কুরআন পড়তে পারিনা (অর্থাৎআমাদের কুরআন মুখস্থ নেই)। তাই আমরাও তোমার পেছনে নামায পড়বো। আমি তাদের নিয়ে আট রাকাত পড়লাম। এবং পরে বিতরও পড়লাম।

এ হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বন্ধুদের কয়েকটি ভুল তুলে ধরছি। বুখারী শরীফের টীকায় তারা হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে ركعات শব্দের স্থলে তারা লিখেছেন ركعة । প্রথম শব্দটি বহুবচন। দ্বিতীয়টি একবচন। হাদীসটির অনুবাদে তারা ৩টি ভুল করেছেন। এক, 'রমযানের রাত্রিতে' কথাটি তারা জুড়ে দিয়েছেন, যা মূল হাদীসে নেই। দুই, ব্র্যাকেটে তারা 'তারাবী' কথাটি জুড়ে দিয়েছেন, এটিও মূল হাদীসে নেই। তিন, এর পরের ভুলটিতো পুরো জালিয়াতি। 'পড়েছেন' স্থলে তারা লিখেছেন, 'আদায় করতেন'। 'পড়েছেন' বললে বোঝা যায় কোন একবারের ঘটনা। আর 'পড়তেন' বা 'আদায় করতেন' বললে বোঝা যায়, এটা তার নিয়মিত আমল

ছিল। ৫ম ভুল করেছেন এই বলে যে, 'আব্দুল্লাহ বলেন'। সঠিক হবে 'জাবির রা. বলেন'।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা র. তার মুসনাদে (১৭৯৫), মুহাম্মদ ইবনে নাসর র. তার 'কিয়ামুল লাইলে' (পৃ ৯০), তাবারানী তার 'আওসাতে' (৩৭৩১) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ তার 'যাওয়ায়েদে মুসনাদে আহমদে' (৫/১১৫ – ২১৪১৫) উদ্ধৃত কনেছেন। হায়ছামী র. আবূ ইয়ালার শব্দে মাজমাউয যাওয়ায়েদে (২/১৭৯) এটি উল্লেখ করেছেন। সকলে একই সনদে বা সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীস যয়ীফ, এটি প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ:

ক. এর সনদে ঈসা ইবনে জারিয়া আছেন, তিনি যয়ীফ। তার হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। তার সম্পর্কে ইবনে মাঈন র. বলেছেন, ليس حديثه بذاك অর্থাৎ তার হাদীস মজবুত নয়। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, ليس بشيئ অর্থাৎ তিনি কোন বস্তুই নন। অপর এক বর্ণনায় আছে عنده مناكير অর্থাৎ তার নিকট আপত্তিকর বর্ণনা আছে। ইমাম নাসায়ী ও আবূ দাউদ র. বলেছেন,' منكر الحديث অর্থাৎ তিনি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। অপর এক বর্ণনায় ইমাম নাসায়ী বলেছেন متروك الحديث অর্থাৎ তার হাদীস বর্জনযোগ্য। ইবনে আদী বলেছেন, أحاديثه غير محفوظة অর্থাৎ তার হাদীস সঠিক নয়। সাজী র. ও উকাইলী র. তাকে যয়ীফদের কাতারে গণ্য করেছেন। ইবনুল জাওযী র.ও তাকে যয়ীফ বলেছেন। (দ্র. তাহযীব ও মীযানুল ইতিদাল)

এই সাতজনের সমালোচনার বিপরীতে শুধু আবূ যুরআ র. বলেছেন, لا بأس به অর্থাৎ তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে ব্যাখ্যা সম্বলিত জারহ বা সমালোচনা অগ্রগন্য হয়ে থাকে। ফলে ঈসা যয়ীফ প্রমাণিত হন। বিশেষত নাসায়ী ও আবূ দাউদ র. যে বলেছেন 'মুনকারুল হাদীস'- এটি সম্পর্কে খোদ মোবারকপুরী সাহেব সাখাবী র. এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به ترك حديثه অর্থাৎ 'মুনকারুল হাদীস' হওয়া ব্যক্তির এমন

একটি দোষ যার কারণে তিনি এর উপযুক্ত হন যে তার হাদীস গ্রহণ করা হবেনা। (দ্র, ইবকারুল মিনান)

এসব কারণেই ইবনে হাজার 'তাকরীবে' তার সম্পর্কে বলেছেন, فيه لين তার মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং হায়ছামী ও আলবানী সাহেব হাসান বললেই এটা হাসান হয়ে যাবেনা।

খ. এ হাদীসের কোথাও তারাবীর কথা নেই। সুতরাং এর দ্বারা আট রাকাত তারাবী প্রমাণ করার চেষ্টা হবে ব্যর্থ চেষ্টা । মহিলাদের নিয়ে ঘরে নামায পড়া থেকে তাহাজ্জুদ পড়ার কথাই সাধারণভাবে বুঝে আসে।

গ. তারাবী সংক্রান্ত ঘটনা হওয়া তো দূরের কথা, এটাকে রমযানের ঘটনা প্রমাণিত করাও মুশকিল। কারণ এই হাদীস মুসনাদে আহমাদে ও তাবারানীর আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে রমযানের কোন কথাই নেই। আর মুসনাদে আবূ ইয়ালায় বলা হয়েছে, يعني في رمضان অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো, রমযানে। একথাটি নিশ্চয়ই হযরত জাবির রা. বা ঈসা ইবনে জারিয়া কিংবা অন্য কেউ বলেছেন। এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটি মুদরাজ বলে বিবেচিত হবে এবং প্রমাণযোগ্য থাকবেনা। অবশ্য 'কিয়ামুল লাইলে'র বর্ণনায় আছে,

جاء أبي بن كعب في رمضان فقال يا رسول الله الخ

অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কাব রমযানে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ----। উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে অনুমিত হয় যে এটা বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপে ঘটেছে। নতুবা একথা বলা অনিবার্য হবে যে, ঈসা ইবনে জারিয়া কখনো রমযানে আসার কথা বলেছেন; কখনো বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো রমযানে; আবার কখনো তিনি রমযানের প্রসঙ্গই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এতে করে তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাই বেশী করে প্রমাণিত হবে। কেননা হাদীসটি কেবল তার সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিয়ামুল লাইলের সনদে মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রাযী আছেন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন فيه نظر অর্থাৎ তার ব্যাপারে আপত্তি আছে। ইবনে হাজার বলেছেন, حافظ ضعيف অর্থাৎ দুর্বল হাফেজে হাদীস। যাহাবী র. 'কাশেফ' গ্রন্থে বলেছেন, الأولى تركه

অর্থাৎ তাকে বর্জন করাই শ্রেয়। সুতরাং 'রমযানে আসলেন' কথাটি তার বৃদ্ধিও হতে পারে।

ঘ. হাদীসটি যে প্রমাণযোগ্য নয় তার একটি প্রমাণ এও হতে পারে, এটি সহীহ হয়ে থাকলে হযরত উমর রা. এর আমলে হযরত উবাই রা. যখন তারাবীর ইমাম হলেন, তখন তিনি আট রাকাতই পড়াতেন। অথচ পেছনে বহু সূত্রে আমরা প্রমাণ করে এসেছি, তিনি বিশ রাকাতই পড়িয়েছেন।

৩নং দলিল: হযরত জাবির রা. বলেন,

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل فيه حتى أصبحنا إلى آخر الحديث

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে রমযানে আট রাকাত ও বিতর পড়লেন। পরের রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম তিনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসবেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত আমরা মসজিদে (অপেক্ষা করতেই) থাকলাম। (অর্থাৎ তিনি আর বের হননি)।

এ হাদীসটিও যয়ীফ, প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা এর সনদেও ঐ পূর্বোক্ত ঈসা ইবনে জারিয়া আছেন। তাছাড়া এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, এটা কেবল এক রাতের ঘটনা ছিল। যেহেতু সে সময় তারাবী নামায জামাতের সঙ্গে পড়ার প্রচলন ছিলনা, তাই এই হাদীসকে সহীহ ধরে নিলেও এই সম্ভাবনা থাকে যে, অবশিষ্ট নামায জামাত ছাড়া একাকী পড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এটা নিছক অনুমান নয়। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা. এর এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারাবীতে শরীক হওয়ার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন,

ثم صلى صلاة لم يصلها عندنا

অর্থাৎ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুজরায় গিয়ে) কিছু নামায পড়েছেন যা আমাদের নিকট পড়েননি। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১১০৪

ঈসা ইবনে জারিয়া বর্ণিত হাদীসটি সঠিক না হওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, সহীহ হাদীস সমূহে একাধিক সাহাবী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের তারাবী পড়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা বুখারী (৯২৪) ও মুসলিমে (৭৬১) উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত আনাস রা. এর বর্ণনা মুসলিম শরীফে (১১০৪), হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রা. এর বর্ণনা বুখারী (৭৩১) ও মুসলিমে (৭৮১) উদ্ধৃত হয়েছে। আবূ যর রা. এর বর্ণনা আবূদাউদ (১৩৭৫) ও তিরমিযী শরীফে (৮০৬) উদ্ধৃত হয়েছে এবং নুমান ইবনে বাশীর রা. এর বর্ণনা নাসায়ী শরীফে (১৬০৬) উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের কারো বর্ণনাতেই রাকাত-সংখ্যার উল্লেখ আসেনি। এসেছে শুধু হযরত জাবির রা. এর বর্ণনায়। তাও ঈসা ইবনে জারিয়ার মতো দুর্বল বর্ণনাকারীর সূত্রে।

আলোচনার এ পর্যায়ে লরামাযহাবী বন্ধুদের আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। তারা আমাদের হানাফী ও অন্যান্য কিছু আলেমের মতামত উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন, এঁরাও তাদের সঙ্গে একমত। সর্বপ্রথম তারা আব্দুল হক দেহলভী র. এর কথা এনেছেন, কিন্তু তাঁর কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেননি। অথচ তিনি তার 'মা সাবাতা বিসসুন্নাহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

والذي استقر عليه الأمر واشتهر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو العشرون

অর্থাৎ ২০ রাকাত তারাবীই সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তী আলেমগণ থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এটাই শেষ পর্যন্ত বহাল হয়েছে।

২য় নম্বরে তারা ইবনুল হুমাম র. এর নাম উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি বলেছেন, ৮ রাকাত নবীজীর সুন্নত আর ২০ রাকাত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত। সেটার অনুসরণের তাগিদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিয়ে গেছেন। ২০ রাকাতের আমল হযরত উমর রা. এর যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে।

৩য় নাম এসেছে কাশ্মীরী র. এর 'আল আরফুশ শাযী' (তারা লিখেছেন, উরফুশ শাযী, এটা ভুল) গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। এটি কাশ্মীরী র. রচিত কোন কিতাব নয়। বরং তাঁর ক্লাসের আলোচনা এক ছাত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তিও ঘটে গেছে। কাশ্মীরী র. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফায়যুল বারী'তে বলেছেন, আহলে হাদীস নামধারীদের উচিৎ সেহরী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, এমন সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ সারারাত) তারাবী পড়া। কেননা এটাই নবীজীর সর্বশেষ আমল ছিল। কিন্তু যারা আট রাকাত পড়ে উম্মতের 'সাওয়াদে আযম' বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এমনকি তাদের

উপর বেদআতের দোষ আরোপ করে, তাদের উচিৎ নিজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা। (দ্র, ৩খ, ১৮১পৃ)

৪র্থ নাম উল্লেখ করা হয়েছে মোল্লা আলী কারী র. এর । কিন্তু যে বক্তব্যটি পেশ করা হয়েছে সেটি মূলতঃ ইবনুল হুমাম র. এর । কারী সাহেব এর পূর্বে ইবনে তায়মিয়া রা. এর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, যারা মনে করে এগারো রাকাতের বেশী পড়া যাবেনা, তারা ভুল করবে। আবার ইবনুল হুমাম র. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর কারী সাহেব ইবনে হাজার মক্কী র. এর একথাও উদ্ধৃত করেছেন যে, ২০ রাকাত তারাবীর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এসব থেকে তারা শুধু নিজেদের মতলবের কথাটিই উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম উদ্ধৃতি তারা দিয়েছেন ইবনে হাজার আসকালানী র. এর । তিনি নাকি বলেছেন, ২০ রাকাতের হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় তা বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়। এ হলো লা-মাযহাবীদের আরেক জালিয়াতি । ইবনে হাজার র. আবূ শায়বা বর্ণিত মারফূ হাদীসে যে বিশ রাকাতের উল্লেখ এসেছে, সে সম্পর্কে বলেছেন, এটা হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিরোধী। 'তা বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়' কথাটি বন্ধুরা নিজেদের পকেট থেকে যোগ করেছেন। (দ্র, ফাতহুল বারী, ৪/৩১০– হাদীস নং ২০১৩) এর পূর্বে ইবনে হাজার রা. ৩০৮ পৃষ্ঠায় ১১,১৩ ও ২০ রাকাত তারাবী সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে বলেছেন বিশ রাকাত শেষ আমল ছিল।

ইবনে হাজার র. এর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর তারা লিখেছেন, একই ধরণের মন্তব্য করেছেন ইমাম নাসায়ী 'যু'আফা' গ্রন্থে, আল্লামা আইনী হানাফী র. 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে, আল্লামা ইবনে আবেদীন 'হাশিয়া দুররে মুখতার' গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু মনীষীগণ।

এ হলো তাদের জালিয়াতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। নাসায়ী র. যু'আফা গ্রন্থে অনুরূপ কোন কথাই বলেননি। তিনি শুধু ২০ রাকাতের মারফূ হাদীস বর্ণনাকারী আবূ শায়বাকে মাতরূক বলেছেন। এতেই যদি ঐ বক্তব্য অনিবার্য হয়, তবে আমরাও তো বলতে পারি হযরত জাবির রা. এর আট রাকাতের হাদীসটি সম্পর্কে নাসায়ী র. বলেছেন, এটি বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়। কেননা তিনি এর বর্ণনাকারী ঈসা ইবনে জারিয়া সম্পর্কেও মাতরূক বলেছেন।

আল্লামা আইনী র.ও উমদাতুল কারী গ্রন্থে অনুরূপ কোন বক্তব্য দেননি। তিনি বরং বিশ রাকাতকেই দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি

হযরত উমর রা. এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীর উপর সাহবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্য হওয়ার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ ইবনে আবেদীন র. এর হাশিয়া দুররুল মুখতারের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, এটা তো রীতিমত তার উপর মিথ্যারোপ। তিনি বরং স্পষ্ট বলেছেন,

(وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا .

وعن مالك ست وثلاثون . وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية والباقي مستحبا ، وتمامه في البحر ، وذكرت جوابه فيما علقته عليه ٢/٤٩٥ .

অর্থাৎ তারাবী বিশ রাকাত। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটাই। পূর্ব-পশ্চিমে এ অনুসারেই মানুষের আমল। হযরত মালেক র. এর মত হলো ৩৬ রাকাত। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, দলিল প্রমাণের দাবী হলো ৮ রাকাত মাসনূন হওয়া ও বাকী রাকাতগুলো মুস্তাহাব হওয়া। এর পূর্ণ বিবরণ 'আল বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের টীকায় (অর্থাৎ মিনহাতুল খালেক- এ) আমি এ কথার জবাব লিপিবদ্ধ করেছি। (দ্র, ২খ, ৪৯৫পৃ)

তার মানে যিনি এত মজবুত ভাবে ২০ রাকাত তারাবী প্রমাণ করছেন, এমনকি ইবনুল হুমামের মতটিও খন্ডন করছেন, তার প্রতিই তারা এমন কথা আরোপ করছেন যে, তিনি বলেছেন, বিশ রাকাত বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়। একই ভাবে আলবানীর অনুসরণে তারা ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম তিরমিযী র. সম্পর্কে বলেছেন, তারা নাকি হযরত উমর রা. এর বিশ রাকাত তারাবীর হাদীসকে দুর্বল বর্ণনা বলেই নির্দেশনা দিয়েছেন।

অথচ তারা কোথাও অনুরূপ নির্দেশনা দেননি। এ আজব তথ্যটি আলবানী সাহেব আবিষ্কার করেছেন তাঁদের একটি কথা থেকে। তাঁরা বলেছেন, روي عن عمر অর্থাৎ হযরত উমর থেকে বর্ণিত। ব্যাস, এটাকেই তিনি ধরে নিয়েছেন দুর্বল বলেই নির্দেশনা দেওয়া। অথচ স্বয়ং তিরমিযী র. সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রেও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দ্র, হাদীস নং ১২৪, ১৭৮, ১৮৪।

মহিলাদের নামায-পদ্ধতি পুরুষের নামাযের মত নয়

নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন, সক্ষমতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা বিষয়ে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে ইবাদতসহ শরীয়তের অনেক বিষয়ে। যেমন, সতর। পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, পক্ষান্তরে পরপুরুষের সামনে মহিলার প্রায় পুরো শরীরই ঢেকে রাখা ফরয। নারী-পুরুষের মাঝে এরকম পার্থক্যসম্বলিত ইবাদতসমূহের অন্যতম হচ্ছে নামায। তাকবীরে তাহরীমার জন্যে হাত উঠানো, হাত বাধা, রুকু, সেজদা, ১ম ও শেষ বৈঠক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে পুরুষের সাথে নারীর পার্থক্য রয়েছে। তাদের সতরের পরিমান যেহেতু বেশী, তাই যেভাবে তাদের সতর বেশী রক্ষা হয় সেদিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে এ ক্ষেত্রগুলোতে। মুসলিম উম্মাহর প্রায় দেড় হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন আমলের ধারা তাই প্রমাণ করে। বিষয়টি প্রমাণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের ফতোয়া ও আছারের মাধ্যমেও।

প্রথমে আমরা এ সংক্রান্ত মারফূ' হাদীস, এবং পরে পর্যায়ক্রমে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের ফতোয়া ও আছার উল্লেখ করবো।

মারফূ' হাদীস

১. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব র. বলেন,

.... أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مر على امرأتين تصليان، فقال: اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (كتاب المراسيل للإمام أبو داود)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সেজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়।" (কিতাবুল মারাসীল, ইমাম আবু দাউদ ৫৫, হাদীস ৮০)

^ List

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আওনুল বারী" (১/৫২০) তে লিখেছেন, 'উল্লিখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য।'

মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী 'সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম' গ্রন্থে (১/৩৫১,৩৫২) এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সেজদার পার্থক্য করেছেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِذَا جَلَسْتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى ، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ : يَا مَلاَئِكَتِى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا ». رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٢٣ في كتاب الصلاة (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود)، وفيه أبو مطيع البلخي وقال العقيلي فيه : كان مرجئا صالحا في الحديث.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সেজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্যে অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২৩, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: মহিলার জন্যে রুকু ও সেজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে পৃথক না রাখা মুস্তাহাব। এটি হাসান হাদীস।

৩. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

جئت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فساق الحديث. وفيه: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها.

(رواه الطبراني في الكبير جـ ٢٢ صـ ١٩-٢٠)

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বলেছিলেন: হে ওয়াইল ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর। (আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী ১৯-২০/২২, এই হাদীসটিও হাসান)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, কিছু কিছু হুকুমের ক্ষেত্রে মহিলার নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। বিশেষত ২নং হাদীসটি দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মহিলার নামায আদায়ের শরীয়ত নির্ধারিত ভিন্ন এই পদ্ধতির মধ্যে ওই দিকটিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা তার সতর ও পর্দার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী।

উল্লেখ্য, এই সব হাদীসের সমর্থনে মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতির পার্থক্য ও ভিন্নতাকে নির্দেশ করে এমন আরো কিছু হাদীস রয়েছে। পক্ষান্তরে এগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ একটি হাদীসও কোথাও পাওয়া যাবেনা যাতে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের নামাযই এক ও অভিন্ন।

সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া

১. হযরত আলী রা. বলেছেন,

إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتصق فخذيها ببطنها. رواه عبد الرزاق في المصنف واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا وإسناده جيد، والصواب في الحارث هو التوثيق.

" মহিলা যখন সেজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সেজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।"

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৮, অনুচ্ছেদ: মহিলার তাকবীর, কিয়াম, রুকু ও সেজদা; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩০৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২২)

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ফতোয়া:

عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال : "تجتمع وتحتفز"(رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, মহিলা কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায় আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

উপরে মহিলাদের নামায আদায় সম্পর্কে দু'জন সাহাবীর যে মত বর্ণিত হল, আমাদের জানামতে কোনো হাদীসগ্রন্থের কোথাও একজন সাহাবী থেকেও এর বিপরীত কিছু বিদ্যমান নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম যে দীন শিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে তা শিখেছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের ফতোয়া থেকেও এ কথাই প্রতীয়মান হয়- মহিলাদের নামায পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ র. কে জিজ্ঞেস করা হল,

كيف ترفع يديها في الصلاة قال حذو ثدييها .

নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে? তিনি বললেন, বুক বরাবর। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

২. ইবনে জুরাইজ র. বলেন,

قلت لعطاء تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل قال لا ترفع بذلك يديها كالرجل وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جدا وقال إن للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك فلا حرج

আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা তাকবীরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে? তিনি বললেন, মহিলা পুরুষের মত হাত উঠাবেনা। এরপর তিনি (মহিলাদের হাত তোলার ভঙ্গি দেখালেন এবং) তার উভয় হাত (পুরুষ অপেক্ষা) অনেক নিচুতে রেখে শরীরের সাথে খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

৩. মুজাহিদ ইবনে জাবর র. থেকে বর্ণিত:

عن مجاهد بن جبر أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة .

তিনি পুরুষের জন্যে মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সেজদা করাকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

৪. যুহরী র. বলেন,

ترفع يديها حذو منكبيها .

মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

৫. হাসান বসরী ও কাতাদা র. বলেন,

إذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكي لا ترفع عجيزتها

মহিলা যখন সেজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সেজদা দিবেনা; যাতে কোমর উচু হয়ে না থাকে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭)

৬. ইবরাহীম নাখায়ী র. বলেন,

إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها ولتضع بطنها عليهما

মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

৭. ইবরাহীম নাখায়ী র. আরো বলেন,

كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت ، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل ، لكي لا ترفع عجيزتها

মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সেজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখে; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭)

৮. খালেদ ইবনে লাজলাজ র. বলেন,

كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشئ .

মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষদের মত না বসে। আবরণযোগ্য কোন কিছু

প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩)

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো ছাড়াও আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের আরো কিছু বর্ণনা এমন আছে যা মহিলা-পুরুষের নামাযের পার্থক্য নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে একজন তাবেয়ী থেকেও এর বিপরীত বক্তব্য প্রমাণিত নেই।

চার ইমামের ফিকহের আলোকে:

ফিকহে ইসলামীর চারটি সংকলন মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত- ফিকহে হানাফী, ফিকহে মালেকী, ফিকহে হাম্বলী ও ফিকহে শাফেয়ী। এবারে আমরা এই চার ফিকহের ইমামের মতামত উল্লেখ করছি।

১. ফিকহে হানাফী

ইমাম আবূ হানীফা র. এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন,

أحب إلينا أن تجمع رجليها في جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل.

আমাদের নিকট মহিলাদের নামাযে বসার পছন্দনীয় পদ্ধতি হলো- উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের মত এক পা দাঁড় করিয়ে রাখবেনা।

কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ, ১/৬০৯

২. ফিকহে মালেকী

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আলকারাফী র. ইমাম মালেক র. এর মত উল্লেখ করেন,

وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك تضع فخذها اليمنى على اليسرى

وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل

নামাযে মহিলা পুরুষের মত কিনা এ বিষয়ে ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণিত, মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকু, সেজদা ও বৈঠক কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক হয়ে বসবেনা, পক্ষান্তরে পুরুষের পদ্ধতি ভিন্ন। আযযাখীরা , ইমাম কারাফী, ২/১৯৩।

৩. ফিকহে হাম্বলী

ইমাম আহমদ র. এর ফতোয়া উল্লেখ আছে ইমাম ইবনে কুদামা র. কৃত 'আলমুগনী' তে:

فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها

তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না এ বিষয়ে কাজী (আবু ইয়ায) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী হাত তুলবে। কেননা, খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা এবং হযরত হাফসা বিনতে সীরীন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন, তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তাই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে এ হিসেবে মহিলা হাত উঠাবে, তবে সামান্য। আহমাদ র. বলেন, তুলনামূলক কম উঠাবে। দ্বিতীয় মত এই যে, মহিলাদের জন্যে হাত উঠানোরই হুকুম নেই। কেননা, হাত উঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয় অথচ মহিলাদের জন্যে এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্যে নিয়ম হল রুকু সেজদাসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে। আলমুগনী, ইবনে কুদামা, ২/১৩৯।

৪. ফিকহে শাফেয়ী

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন,

وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدهن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها.

আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দনীয় হল, সেজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে। পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সেজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়। অনুরূপ রুকু, বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাযত হয়। কিতাবুল উম্ম, শাফেয়ী, ১/১৩৮

দেখা যাচ্ছে, হাদীসে রাসূল, সাহাবা ও তাবেয়ীনের ফতোয়া ও আছারের মতই চার মাযহাবের চার ইমামের প্রত্যেকেই পুরুষের সাথে মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের কথা বলেছেন। মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত উপরোক্ত কেউ-ই বলছেন না, মহিলাদের নামায পুরুষের নামাযের অনুরূপ। বরং সকলেই বলছেন, পুরুষের নামায থেকে মহিলার নামায কিছুটা ভিন্ন।

নারী-পুরুষের নামাযের এ পার্থক্য শুধু যে এ চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ও অনুসারীগণ-ই স্বীকার করেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং আমাদের যে আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ভাইয়েরা এ পার্থক্যকে অস্বীকার করেন, তাদেরও কোন কোন অনুসৃত আলেম এপার্থক্যকে স্বীকার করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ দাউদ গযনবী রহ. এর পিতা আল্লামা আব্দুল জাব্বার গযনবী র. কে জিজ্ঞেস করা হল, মহিলাদের নামাযে জড়সড় হয়ে থাকা কি উচিত? জবাবে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখেন, এর উপরই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাব ও অন্যান্যদের মাঝে আমল চলে আসছে।

এরপর তিনি চার মাযহাবের কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করার পর লেখেন, মোট কথা, মহিলাদের জড়সড় হয়ে নামায পড়ার বিষয়টি হাদীস ও চার মাযহাবের ইমামগণ ও অন্যান্যের সর্বসম্মত আমলের আলোকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ ও উম্মতের সর্বসম্মত আমল সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।

ফাতওয়া গযনবিয়্যা, ২৭ ও ২৮; ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস, ৩/১৪৮-১৪৯; মাজমুআয়ে রাসায়েল, মাওলানা আমীন সফদর উকারবী, ১/৩১০-৩১১।

মাওলানা আলী মুহাম্মদ সাঈদ 'ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস ' গ্রন্থে এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। মাজমুআয়ে রাসায়েল, ১/৩০৫।

মাওলানা আব্দুল হক হাশেমী মুহাজিরে মক্কী র. তো এই পার্থক্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকাই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম

نصب العمود في تحقيق مسألة تجافي المرأة في الركوع والسجود والقعود.

মুহাদ্দিস আমীর ইয়ামানী র. 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে এবং স্বসময়ের আহলে হাদীসদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান র. 'আউনুল বারী' তে নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের পক্ষেই তাদের মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সহীহভাবে বিষয়টি অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

উমরী কাযা : কুরআন সুন্নাহর আলোকে

তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতের আলোচনার পর কুরআনে সর্বাধিক গুরুত্ব নামাযের প্রতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত শরীয়তে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান এবং তা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

رأس الامر الاسلام وذروة سنامه الجهاد. رواه الترمذى فى سننه ٨٩/٢ وقال : هذا حديث حسن صحيح.

"সব কিছুর মূল হল ইসলাম আর নামায হল এর খুঁটি; জিহাদ এর উচ্চতা।"–জামে তিরমিযী ২/৮৯ হা.২৬১৬

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদা রা. কে বলেন:

ولا تترك صلاة مكتوبة معتمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة.

"তুমি ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব ওঠে যায়।" সুনানে ইবনে মাযাহ হা.৩০১

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাঁর গভর্ণরদের নিকট ফরমান লিখে পাঠান যে–

أن اهم امركم عندى الصلاة فمن حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

"নিঃসন্দেহে তোমাদের সকল কর্মের মধ্যে নামাযই আমার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করল, সে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা নষ্ট করবে সে অপর বিষয়াবলীকে আরো অধিক বিনষ্ট করল।" এরপর তিনি নামাযের সময়ের বিবরণ উল্লেখ করেন।– মুয়াত্তা ইমাম মালেক পৃ.৩

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে শরীয়তে নামাযের মান ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে তাও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

নামাযের সময় নির্ধারিত

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا "নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রতি নামায অপরিহার্য রয়েছে, যার সময়সীমা নির্ধারিত।"(–সূরা নিসা ১০৩) পবিত্র কুরআনে নামাযের সময়সীমা নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি নির্ধারিত সময়ে তা অনাদায় থেকে গেলে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সহীহ হাদীস ও আছারে সাহাবাতে বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

'আদা ' ও 'কাযা'র বিবরণ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যদি নামায আদায় করা হয় তবে তাকে 'আদা' বলা হয় এবং পরে আদায় করা হলে 'কাযা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এক হাদীসে ইবাদতের 'কাযা'র দর্শনটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে বুঝিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার মা মান্নত করেছিলেন যে, তিনি হজ্জ করবেন। কিন্তু তা পূর্ণ করার আগেই তিনি মারা গেছেন। (এখন আমার করণীয় কী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন–

حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ কর। বল তো যদি তোমার মা কারো নিকটে ঋণী হতেন তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে? মহিলাটি বলল,হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তোমরা আল্লাহর ঋণও পরিশোধ কর। কেননা তিনি তাঁর প্রাপ্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।"– সহীহ বুখারী ১/২৪৯-২৫০ সুনানে নাসায়ী ২/২

অপর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল ! আমার পিতা মারা গেছেন । কিন্তু তিনি হজ্জ করতে পারেননি । আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

أرئيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم, قال :فدين الله احق.

বলতো তোমার পিতা যদি কারো নিকট ঋণী হতেন তবে কি তুমি তার ঋণ পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–আল্লাহর ঋণ অধিক আদায়যোগ্য। –সুনানে নাসায়ী ২/৩

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– فاقضوا الله 'তোমরা আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর', فدين الله احق 'আল্লাহর ঋণ আদায়ের অধিক উপযুক্ত', এসব থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, যে ইবাদতটি বান্দার উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, তা থেকে দায়মুক্তির পথ হল তা আদায় করা। নির্ধারিত সময় পার হওয়ার ফলে যেমন মানুষের ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি আল্লাহ তাআলার ঋণ থেকেও দায়মুক্ত হওয়া যায় না।

শরীয়তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের ব্যাপারেও এই মূলনীতি প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের 'আছার' এ প্রমাণই বহন করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

১.এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সফর করছিলেন। শেষ রাতে তাঁরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করলেন এবং হযরত বিলাল রা. কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে হযরত বিলাল রা.ও তন্দ্রাভিভূত হয়ে গেলেন এবং সবার ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল। ঘুম থেকে জাগার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। এর পর ইরশাদ করেন ঘুম বা বিস্মৃতির কারণে যার নামায ছুটে গেল, যখন সে জাগ্রত হবে তখন যেন তা আদায় করে।"

প্রসিদ্ধ সকল হাদীসগ্রন্থেই বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, সেই দুই রাকাত (যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা হিসেবে আদায় করেছেন) আমার নিকট সমগ্র দুনিয়ার মালিকানা লাভ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।" –মুসনাদে আহমদ ৪/১৮১ হা.২৩৪৯ মুসনাদে আবূ ইয়ালা ৩/২২-২৩ হা.২৩৭১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর খুশির কারণ হল, এই ঘটনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরবৃন্দ, যাঁরা আগামী দিনে শরীয়তের বিধি-বিধান পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের সামনে (এ

মূলনীতি) স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নামায নির্ধারিত সময়ে আদায়যোগ্য ইবাদত হলেও যদি তা সে সময়ে আদায় করা না হয়, তবে সময়ের পরে হলেও আদায় করা অপরিহার্য। –আল-ইসতিযকার ১/৩০০

২.খন্দকের যুদ্ধে শত্রুবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। তাঁরা রাতের বেলায় তা আদায় করেন। –সহীহ বুখারী ১/৮৩, ৮৪, ৮৯, ৪১০, ২/৫৯০ সহীহ মুসলিম ১/২২৬,২২৭

৩.খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন-

لايصلين احد العصر الا فى بنى قريضة "তোমাদের কেউ বনী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের নামায পড়বে না।"–সহীহ বুখারী ১/১২৯ ২/৫৯০ সহীহ মুসলিম ২/৯৬

সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হলেন। পথে আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হলে কতক সাহাবী পথেই নামায পড়ে নেন। আর কতক সাহাবী বনী কুরায়যায় পৌঁছে পরে আসরের কাযা পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা শুনেছেন। কিন্তু পরে কাযা আদায়কারী সাহাবীদের একথা বলেননি যে, নামায শুধু নির্ধারিত সময়েই আদায়যোগ্য; সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর কোন কাযা নেই।

এসব দৃষ্টান্তের বিপরীতে কোন একটি হাদীসে একথা উল্লিখিত হয়নি যে, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া না হলে তা আর পড়তে হবে না। ইস্তেগফার করে নেওয়াই অপরাধ মোচনের জন্য যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি দলীল হল, ইজমায়ে উম্মত। মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময়ের পরে হলেও তা আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা বা ওযরবশত নামায কাযা হয়ে যাওয়া উভয়টাই সমান। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. বিনাওযরে কাযাকৃত (ছেড়েদেয়া) নামায আদায় করা অপরিহার্য হওয়ার স্বপক্ষে শরয়ী প্রমাণাদি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله عليه السلام. . . الاستذكار ١/٣٠٢-٣٠٣

"ফরয রোযার মত ফরয নামাযও সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কাযা করতে হয়। এ ব্যাপারে যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট দলীল, যার অনুসরণ করা ঐ সব বিচ্ছিন্ন মতের প্রবক্তাদের জন্যও অপরিহার্য ছিল– তারপরও কিছু দলিল উল্লেখ করা হল। যথাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ...। আল ইসতিযকার ১/৩০২,৩০৩

পঞ্চম হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোন কোন বাহ্যপূজারি ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করে যে, ফরয নামায সময় মত পড়া না হলে তা আর কাযা করতে হবে না। তখনকার এবং পরবর্তীযুগের ইমামগণ এই মতটি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. (মৃত.৪৬৩ হি.) তাঁর রচনা আল ইসতিযকারে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপি (১/২৯৯-৩১১) শুধু এই বিষয়েই আলোচনা করেছেন। এবং সহীহ হাদীসের আলোকে উপরোক্ত মতটির ভ্রান্তি সুপ্রমাণিত করেছেন। একে 'সাবীলুল মুমিনীন' তথা সকল মুমিনের পথ থেকে বিচ্যুত মত হিবেবে আখ্যায়িত করেছেন। (১/৩০২) অন্যান্য ইমামগণও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেছেন। যার কিছু উদ্ধৃতি আমাদের এ আলোচনায় রয়েছে। উলামায়ে কেরামের ভূমিকার কারণে এই মতটি একদম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তা শুধু পাওয়া যেত বইয়ের পাতায়, বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ইদানিং কোন কোন মহল থেকে এই পরিত্যক্ত মতটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে দেখা যাচ্ছে।

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক বিনষ্ট করা হলে শুধু অনুতপ্ত হওয়া ও ইসতিগফার করাই তাওবার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং হকদারের প্রাপ্য আদায় করাও তাওবার অপরিহার্য অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক সহীহ হাদীসে 'আল্লাহর হক্ব'কে বান্দার হক্বের সাথে তুলনা করে বলেন– دين الله احق بالوفاء 'আল্লাহর হক্ব বিনষ্ট হলে তা আদায় করা (বান্দার হক্বের চেয়ে) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।' আতএব আলোচ্য মাসআলাতে নামাযের কাযা আদায় করা 'তাওবা'রই অংশ। কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা , আগামীতে এ কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া এবং ছুটে যাওয়া নামাযসমূহ আদায় করা– এসব মিলেই ব্যাক্তির

তাওবা পূর্ণ হবে। আতএব তাওবাই যথেষ্ট কথাটি ঠিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে তওবার মধ্যে কাযা হয়ে যাওয়া নামাযসমূহ আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত । শরীয়তের দলীলসমূহ থেকে তাই প্রমাণ হয় এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা ও হয়েছে।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. এই বিষয়টিকেই নিম্নোক্ত শব্দে ব্যাক্ত করেছেন–

وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون النور ٣١ ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.الاستذكار ٣٠٧/١

আর একথাও ঠিক নয় যে, হাদীস শরীফে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার বিষয়টিকে ঘুম বা বিস্মৃতি এ দুই অবস্থার মধ্যেই সীমাদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসের বক্তব্য দেখুন–

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذاذكرها.

'যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে থাকে, তার কাফফারা হল যখন তার নামাযের কথা স্মরণ হবে তখন তা আদায় করা।' সহীহ বুখারী হা.৫৯৭ সহীহ মুসলিম হা.৬৮৪/৩১৫

উপরোক্ত হাদীসে ঘুম ও বিস্মৃতি এ দুই অবস্থায় কাযা হয়ে যাওয়া নামায আদায় করার আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু নামায আদায়ের বিষয়টিকে এ দুই অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি এবং বলা হয়নি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে যে নামায পরিত্যাগ করা হয়েছে তা আর আদায় করার প্রয়োজন নেই, বা সময়ের পরে আদায় করা হলে তা কোন নামাযই নয়; বরং একটি অর্থহীন কাজ।

উসূলে ফিকহের সাথে সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন যে, এ হাদীসে 'দালালাতুন নস এর নীতি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে নামায় পরিত্যাগকারী ব্যক্তির জন্যও নামায আদায় করার বিধানটি সুপ্রমাণিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– ولا تقل لهما اف'পিতামাতার সামনে 'উফ' (বিরক্তিসূচক) শব্দটি উচ্চারণ করো না।' এই আয়াতে শুধু 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এ আয়াত থেকে পিতামাতাকে প্রহার করার অবৈধতাও সুপ্রমাণিত। যে নীতিতে শেষোক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হল উসূলে ফিকহের পরিভাষায় তা 'দালালাতুন নস' এর অন্তর্ভুক্ত । আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রেও এ একই নীতি কার্যকর হয়েছে।

শুধু তাই নয় হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনা এবং পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

« إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ».

"যখন তোমাদের কেউ নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায থেকে গাফেল হয়ে যায় তো যখন তার বোধোদয় হবে তখন সে যেন তা আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى 'আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় কর।' সহীহ মুসলিম হা.৬৮৪/৩১৬

অন্য হাদীসে এসেছে–

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها اذا ذكرها.

"যে ব্যক্তি নামায রেখে ঘুমিয়ে গেছে বা নামায থেকে গাফেল রয়েছে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর কাফফারা হল যখন তার নামাযের কথা স্মরণ হবে তখন তা আদায় করে নেওয়া। হা.৬১৪

উপরোক্ত হাদীসসমূহে সামান্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোন নামায সময় মত আদায় না করা হলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করা অপরিহার্য। নামাযটি ভুলক্রমে কাযা হোক, নিদ্রার কারণে হোক অথবা গাফলতি বা অবহেলার কারণে হোক। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের যে আয়াতাংশটি –أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى উদ্ধৃত করেছেন তা খুবই মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা উচিত। কেননা এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত আয়াতে নামাযের কাযা আদায় করার বিধানটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তা তখনই হবে যখন আয়াতের অর্থ এই হবে 'আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় কর।' অর্থাৎ যখন এই ফরয দায়িত্বটির ব্যাপারে মানুষের বোধোদয় ঘটবে তখন তা আদায় করা অবশ্যকর্তব্য।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু নামায পরিত্যাগ করেছে এমন ব্যক্তির যখন তাওবার তাওফীক হয় এবং গাফলতি ও অবহেলা থেকে জাগ্রত হয় তখন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার হুকুমের কথা তার স্মরণ হয় এবং এর গুরুত্বের

ব্যাপারে তার বোধোদয় ঘটে। অতএব উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী এ ব্যক্তির কাযাকৃত নামাযসমূহ আদায় অপরিহার্য।

এত কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া নামাযকে সময়চ্যুত করা অনেক বড় কবীরা গোনাহ, এ থেকে খলেস হৃদয়ে তাওবা ও ইস্তেগফার করা অপরিহার্য । কিন্তু সময় পার হওয়ার পর নামায পড়া হলে এতে কোন লাভ নেই– এমন কথা নিঃসন্দেহে শরীয়তের উসূল ও নীতিমালা এবং সহীহ হাদীসের পরিপন্থি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি বিষয় অপরিহার্য প্রমাণিত হওয়ার পর তা অনর্থক হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আর ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারীর জন্য কাযা আদায় করা যে অপরিহার্য তা তো আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনায় উল্লেখিত শরয়ী দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি তো সবাই জানেন, যাতে পরবর্তী যুগের আমীরদের ব্যাপারে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নামায আদায় করবে। সে সময় দীনদারদের করণীয় ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

صل الصلاة لوقتها فإن ادركتها معهم فصل فإنها لك نافلة

“তোমরা সময় মত নামায পড়ে নাও, এরপর যদি সেইসব আমীরের সাথে নামায আদায়ের পরিস্থিতি আসে (অর্থাৎ তখন যদি তোমরা মসজিদে থাক) তবে তাদের সাথেও নামায পড়ে নিবে। এটা তোমাদের জন্য নফল হবে। (সহীহ মুসলিম হা.৬৪৮/২৩৮-২৪৪ সুনানে আবু দাউদ হা.৪২৭-৪২৮)

এসব আমীর যারা সময় পার হওয়ার পর নামায পড়ছিল তাদের নামায নিঃসন্দেহে কাযা ছিল। কিন্তু তাদের এই নামাযকে অনর্থক সাব্যস্ত করা হয়নি, তাদের পেছনে আদায় করা নামাযটিকে নামায হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। যদি সময়ের পরে নামায পড়া অনর্থকই হত তবে না ইক্তেদা শুদ্ধ হত, না আদায়কৃত নামাযটি শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য হত।

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, নির্ধারিত সময় থেকে নামায বিলম্বিত করার কারণে হাদীস শরীফে সেই সব আমীরের অবশ্যই নিন্দাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু (সময়ের পরে হলেও) তাদের নামায পড়াকে নিন্দার চোখে দেখা হয়নি বা এক একটি অর্থহীন কাজ হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়নি। – আল আসতিযকার ১/৩০৪-৩০৫

^ List

সূরা মারয়াম (আয়াত ৫৯) এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خلفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., মাসরুক র., উমর ইবনে আব্দুল আযীয র., কাসেম ইবনে মুখাইমিরা সহ. প্রমুখ মুফাসসির সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, এখানে নামায বিনষ্ট করার অর্থ হল, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নামায আদায় করা। তাঁরা বলেছেন-

أخروها عن مواقيتها ولو كان تركا لكان كفرا

অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতে যে শাস্তির কথা এসেছে তা নির্ধারিত সময়ের পরে পড়ার কারণে। অন্যথায় একদম নামায ছেড়ে দেওয়া তো কুফরী। আল ইসতিযকার ১/৩১০ তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/১৪২

এ থেকে বোঝা গেল, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করা কবীরা গোনাহ হলেও সময়ের পরে নামায পড়ে নেওয়া অনর্থক কাজ নয়। একেবারে ছেড়ে দেওয়া থেকে তা অনেক ভাল। এতে একটি কুফরী কাজে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আরো দেখুন, আফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৫৬, সূরা মাউন ৪-৫

হযরত আব্দুল্লহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের পালনকর্তা কী বলেন? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এভাবে তিন বার প্রশ্নোত্তরের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ বলেন–

عزتي وجلالي لا يصليها لوقتها إلا أدخلته الجنة ومن صلاها لغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته . رواه الطبراني في الكبير ١:٣٢٨ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :فيه يزيد بن قتيبة ذكره ابن ابي حاتم ن وذكر له راويا واحدا و لم يوثقه و لم يجرحه انتهى.وله شاهد من حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير والأوسطن وعند احمد في المسند ن وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف.راجع المجمع ٢:٣٩

“আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কসম! যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, আর যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময় পার

হওয়ার পর তা আদায় করবে আমি তাকে অনুগ্রহও করতে পারি এবং আযাবও দিতে পারি"। -আল মুজামুল কাবীর ১০/২২৮, হাদীস ১০৫৫৫) হাদীসটি 'হাসান'।

সামান্য চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই হাদীসে নামাযকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ নামাযটিকে অনর্থক বা মূল্যহীন সাব্যস্ত করা হয়নি।

কাযা নামায সমূহ সুন্নতসহ আদায় করতে হবে কিনা এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. বলেন–

المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال بالنوافل ، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها أحسن.

"যদি কাযা নামাযের পরিমাণ অনেক বেশি হয় তবে সুন্নত নামাযে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ফরয নামাযসমূহ আদায় করাই উত্তম। আর যদি কাযা নামাযের পরিমাণ কম হয় তবে ফরযের সাথে সুন্নত নামায আদায় করলে তা একটি উত্তম কাজ হবে।" –ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া র, ২২/১০৪

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ কথা হল, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর বালেগ হওয়ার পর থেকে নামায ফরয হয়। এ ফরয শরীয়তের সকল ফরযের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য, যে বিষয়টি শরীয়তের অকাট্য দলীলসমূহের ভিত্তিতে প্রমাণিত, তা কারো উপর থেকে রহিত করার জন্য অনুরূপ মানের অকাট্য দলীল প্রয়োজন। কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার বিধানকে রহিত করার দুঃসাহস কার হতে পারে? আলোচ্যবিষয়ে কোন অকাট্য দলীলতো দূরের কথা, অতি দুর্বল কোন দলীলের ভিত্তিতেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে , যে নামায মানুষের উপর ফরয হয়েছিল তা ব্যক্তির অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণে রহিত হয়ে গেছে। এর বিপরীতে বুদ্ধিমান মাত্রই স্বীকৃত এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট ভাষ্যও যে, ঋণ আদায় করা ছাড়া তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না।' এ মৌলিক নীতিটি ছাড়াও বহু শরয়ী দলীল প্রমাণ দ্বারা কাযা নামাযসমূহ আদায় করা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। এসব শরয়ী দলীলের বিরোধিতা করা এবং 'সাবীলুল মুমিনীন' থেকে বিচ্যুত হওয়া কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আলেমের কাজ হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল-অবিচল থকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১.আলোচ্য মাসআলার শিরোনামটি 'উমরী কাযা' সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধির নিরিখেই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যথায় এর সঠিক নাম হবে قضاء الفوائت 'কাযাউল ফাওয়াইত'। এ নামটিই বিষয়বস্তুর অধিক উপযুক্ত । কেননা 'উমরী কাযা' নামে কোন কোন অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বইয়েঅন্য

একটি নামাযের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন মহলে তা বেশ প্রসিদ্ধও বটে। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এ সংক্রান্ত যে হাদীসটি সেসব পুস্তক-পুস্তিকায় উল্লেখিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বাতিল। যথা: 'জুমআতুল ওয়াদা' বা রমযান মাসের শেষ জুমায় এক নামায পড়ে নিলে তা সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে।' এ রেওয়ায়াত এবং এ জাতীয় অন্য সকল রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুসারে 'মওযূ'। মোল্লা আলী ক্বারী র. মওযূ হাদীসসংক্রান্ত তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবে লেখেন:

حديث — من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة– باطل قطعا. لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا تقوم مقام فائتة سنوات.

"রমযান মসের শেষ জুমায় একটি ফরয নামাযের কাযা আদায় করা হলে তা জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে" এ রেওয়ায়াতটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কেননা এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে, কোন ইবাদত কয়েক বছরের ছুটে যাওয়া নামাযের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।" আল-মওযূআতুল কুবরা ১২৫

অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এব্যাপারে একমত। অতএব এজাতীয় ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহ থেকে প্রতারিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। বরং নামাযের ব্যাপারে পূর্ণ গুরুত্ত দেওয়া অপরিহার্য। যেভাবে আল্লাহ তাআলা তা ফরজ করেছেন ঠিক সেভাবেই সময় মত আদায় করা জরুরি। যদি অবহেলাবশত কোন নামায কাযা হয়ে যায় তবে যে পরিমাণ নামায কাযা হয়েছে সবই আদায় করতে হবে। এক নামায আদায় করে সকল নামাযই আদায় হয়ে গিয়েছে ; এ ধারণা করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়।

২.এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করাও অনুচিত হবে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় নামায কাযা করা হলে তাতে কোন অপরাধ নেই। এ জন্য তারা সকাল ৮/৯ টায় ঘুম

থেকে ওঠার অভ্যাস করে নিয়েছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর ফজরের নামায পড়েন বা একে কাযা নাাযের ফিরিস্তিতে যোগ করে দেন যে, পরবর্তী সময়ে কাযা করে নেব।

এ জাতীয় কর্মকাণ্ড নামাযের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস শরীফে অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় নামায ছুটে গেলে তা কাযা করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের কোথাও মানুষকে নিদ্রার ব্যাপারে এতটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি যে, সময় মত জাগ্রত হওয়ার কোন ফিকিরই তাকে করতে হবে না। শরীয়তে ইশার পরে গল্পগুজব করতে নিষেধ করা হয়েছে যে, এতে ফজরের নামায কাযা হয়ে যেতে পাবে। অনুরূপ কোন ওযরবশত ঘুমুতে বিলম্ব হলে যদি এই আশংকা হয় যে, সময় মত ঘুম ভাঙ্গবে না এবং নামায কাযা হয়ে যেতে পারে তাহলে সামর্থ অনুযায়ী ঘুম থেকে জাগার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও জরুরি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদের সফর থেকে ফেরার পথে এরূপ বিলম্বে ঘুমুতে যাওয়ার সময় হযরত বিলাল রা. কে সময় মত জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী হা.৫৯৫ সহীহ মুসলিম ৬৮০-৬৮১

যারা শোয়ার সময় জাগ্রত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা তো দূরের কথা, সঠিক সময়ে জাগার নিয়তও রাখে না এবং নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন তাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং এ জাতীয় মনগড়া বাহানা পরিত্যাগ করে এই মহান ইবাদতটির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

৩.আলোচ্য মাসআলাতে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, 'কাযা' আল্লাহ তাআলার ঋণ পরিশোধের একটি পন্থা মাত্র । এটা কখনো 'আদা'র বিকল্প নয়। অতএব পরে কাযা করে নেব এই অজুহাতে কখনো নামাযকে সময়চ্যুত করা যাবে না। যদি 'কাযা' নামাযটি 'আদা'র পূর্ণ বিকল্পও হত তবুও নামাযকে বিলম্বিত করা কোনক্রমেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতো না। কেননা কাযা আদায় করা পর্যন্ত বেঁচে থাকারই বা কী নিশ্চয়তা রয়েছে ? যখন নামাযকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করাই একটি মারাত্মক কবীরা গোনাহ এবং শুধু কাযা করে নিলেই অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায় না, তো আগামীতে কাযা করার অনিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে নামাযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা কোন মুমিনের কাজ হতে পারে না।